Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গনতন্ত্রের সংঘাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহেরা আকতার

রোলঃ 227020191228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গনতন্ত্রের সংঘাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহেরা আকতার

রোলঃ 227020191228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গনতন্ত্রের সংঘাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহেরা আকতার, আইডিঃ 227020191228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গনতন্ত্রের সংঘাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাহেরা আকতার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তাহেরা আকতার

আইডিঃ 227020191228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সবথেকে চর্চিত বিষয় গুলোর মধ্যে অন্যতম কিছু পরিভাষা হলো– গণতন্ত্র, জাতি-রাষ্ট্র,উদারতাবাদ,সমাজতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি । বিষয়গুলো প্রায়শই মুসলিম তাত্ত্বিকদের লেখনীতে মতভেদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । উসমানী সালতানাতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি অবশিষ্ট ছিল। উসমানীয়দের পতনের পর মুসলিম তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করেন । বিশেষ করে রশিদ রিদা খিলাফতের বিকল্প হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিভাষা টি সামনে আনেন । যে কয়জন মুসলিম তাত্ত্বিকগন আধুনিকতাকে মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে জামালুদ্দিন আফগানি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী । যিনি ছিলেন প্যান ইসলামিক তত্ত্বের উদ্ভাবক । আফগানির মতে– মুসলমানদের আধুনিকতার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা তথা ইতিবাচক ভাবে বিবেচনা (Approach) করতে হবে । প্যান ইসলামিজম তত্ত্বে তিনি একটি ইসলামী ঐক্যের পক্ষে মত দেন,যা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত এবং খিলাফতকে সামনে রেখে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করবে ।

আফগানির পাশাপাশি মিশরীয় স্কলার মুহম্মদ আবদুহু মুসলিম বিশ্বে রাজনীতির নতুন ধারণা সৃষ্টিতে যৌথ ভাবে ভূমিকা পালন করেছেন । ইসলামী রাষ্ট্র ধারণা পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে উন্নীত হয়েছে পাক-ভারতীয় স্কলার সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর মাধ্যমে । তিনি হাকিমিয়াতকে(সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য) ইসলামি রাষ্ট্রের সবচেয়ে জরুরি উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন,যা পশ্চিমা রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে ।

মিশরীয় স্কলার হাসান আল বান্না যদিও জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তবুও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুলাংশে মওদুদী কে অনুসরণ করেছেন । প্রসংগত, উসমানি খিলাফতের পতনের পর মুসলিম ব্রাদারহুড ই ছিলো সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আন্দোলন,যা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মিশন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ।
বিংশ শতাব্দীতে অন্য যেকোনো মুসলিম তাত্ত্বিকের তুলনায় মওদুদীর তাত্ত্বিক ভূমিকা ছিলো অধিক । শরিয়াহ'র ব্যাপারে তার অনড় অবস্থানের কারণে পশ্চিমারা তাকে মৌলবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন । আবুল আলা মওদুদী দ্বারা প্রভাবিত সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামপন্থী তাত্ত্বিক, যিনি বান্না পরবর্তী সময়ে ব্রাদারহুডে বড়

ভূমিকা পালন করেছেন । মওদুদী,বান্না ও কুতুবদের চিন্তাধারা একাডেমিয়াতে রাজনৈতিক ইসলাম (political Islam) কিংবা ইসলামপন্থা (ইসলামিজম) হিসেবে পরিচিত । এই তাত্ত্বিকদের ইসলামপন্থী বলা হয়ে থাকে ।

ইসলামপন্থী দের এই তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ এর পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ইসলামপন্থিদের আর ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে । পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশে এর একটু প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে । এরই অংশ হিসেবে কিছু কিছু দেশে ইসলামপন্থী রা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি চলে আসে । যেমন: তুরস্ক,পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলাম পন্থিরা ভালো ফলাফল অর্জন করে। কিন্তু আদতে ইসলামপন্থী তাত্ত্বিকদের প্রস্তাবিত ইসলামি রাষ্ট্রের মডেল পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিংবা বর্তমানেও নেই । ফ্যাল্ডম্যান তার বই ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান (The Fall and Rise of The Islamic State) -এ এভাবে যুক্তি তুলে ধরেন, আজকের ইসলামি রাষ্ট্র নিয়ে বিতর্কের মূল কারণ আদতে এর কোনো মডেল বর্তমান বিশ্বে উপস্থিত না থাকা ।

মুসলিম ভূখণ্ড গুলোতে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলোর উত্থানের ফলে শরিয়াহভিত্তিক সমাজ ও সরকারগুলোর পতন হয় । পাশাপাশি আধুনিক রাষ্ট্রের পরিভাষা গুলো পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । হাল্লাকের মতে--আধুনিক রাষ্ট্রের মূলনীতি গুলো জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা অন্য যেকোনো পরিভাষা — ইসলামের নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের বিপরীত ।

এসব বিতর্কের মাঝে ইসলামী রাষ্ট্র তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায় এখানে উল্লেখ করা জরুরি– যা শুরু হয়েছে মালিক বেননাবি,হাসান আত-তুরাবি,ইউসুফ আল কারজাভি ও রশিদ আল ঘানুসির মাধ্যমে । তারা আধুনিক রাষ্ট্রধারণার ব্যাপারে তুলনামূলক ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন; বিশেষত গণতন্ত্রের ব্যাপারে ।

আলজেরিয়ান স্কলার মালিক বেননাবি যুক্তি তুলে ধরেন– "সভ্যতার পুনর্জাগরণ ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়" । বেননাবি কে মনে করা হয় বর্তমান সময়ের ইবনে খালদুন।

বেননাবির অনুসরণে সুদানের রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক হাসান আত তুরাবি মনে করতেন– ”ইসলামি সমাজ ইসলামি রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত । কেননা,সমাজ রাষ্ট্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,সমাজ সর্বদা বিদ্যমান থাকে কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির উত্থান -পতন রয়েছে।”

কারজাভি মনে করেন– “মুসলমানদের বর্তমান সভ্যতার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।”
ঘানুসি যুক্তি তুলে ধরেন–’ ইউরোপিয়ানরা মুসলমান সভ্যতার উপাদান সমূহ গ্রহণ করে নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে । সুতরাং, মুসলমানদের ও পশ্চিমা সভ্যতার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করা দরকার । যেমন– গনতন্ত্র;যা গত দুইশত বছরে শাসনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে সাব্যস্থ হয়েছে ‘’
ফারাবি’'র পর আল মাওয়ার্দির আল আহকাম আস- সুলতানিয়্যাহ,নিজামুল মুলকের সিয়াসেতনামা,ইমাম গাজালের রাজনীতি, রাজনৈতিক শক্তি ও শাসকদের প্রতি উপদেশ বিষয়ে নানা রচনা ছিল আব্বাসী ও সেলজুক আমলে এই বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তিনজন তাত্ত্বিকই সরকার কিংবা সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেছেন। মাওয়ার্দি ছিলেন বিচারপতি, নিজামুল মুলক ছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের উজির এবং গাজালী ছিলেন মাদ্রাসায় নিজামিয়ার প্রধান যা মূলত সে সময় রাজনীতিবিদ আমলা ও কূটনৈতিক তৈরিতে প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আব্বাসী পরবর্তী সময়ে ইবনে তাইমিয়া অবদান রাখেন, যখন মুসলিম বিশ্বের সব জায়গায় চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাওয়াই এসব পতনের মূল।

অপরদিকে বিভিন্ন দেশের ইসলামী দল গুলোর মাঝে গণতন্ত্রের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা বেশ জোরেশোরেই লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল যেমন তুরস্কে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি), মরক্কোতে পিজিডি ইত্যাদি।

মূলত ইসলামের পুনর্জাগরণের বিষয়টি ইসলামী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে পূর্ববর্তী ইসলামপন্থীরা ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইসলামের জাগরণ চেয়েছেন আর সমসাময়িক ইসলামপন্থীরা সভ্যতার বিনির্মাণের মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণ চান। অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতার সাথে সমন্বিত পদ্ধতির(Integrated Approach) মাধ্যমে সভ্যতার বিনির্মাণ ।

ইমাম ইবনে কাইয়ুম (রহ.) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন —-”রাজনীতি হচ্ছে এমন এক কাজ যার মাধ্যমে মূলত মানুষ কল্যাণের নিকটবর্তী হয় এবং অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে শরীয়াহর কোনো বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন না করা হয় “
পরবর্তী সময়ে তিনি ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন—-
“ ইনসাফ পূর্ণ রাজনীতি কখনো শরিয়াহর বিধি-বিধানের পরিপন্থী হতে পারে না বরং তা শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তা শরীয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে।প্রচলিত পরিভাষায় আমরা একে রাজনীতি বলি; তা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের(সা:) ইনসাফ ছাড়া কিছু নয়।
ইমাম গাজ্জালী (রহ.) থেকে তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করেন—-
“ দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের চরণভূমি, দুনিয়া ব্যাতীত দ্বীনের পূর্ণতা অর্জিত হয় না। ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই সহোদর ভাই তুল্য। ধর্ম হচ্ছে মূল; রাজ বাদশাহ রা হচ্ছে এর প্রহরীর ন্যায়। মূল ছাড়া কোনো জিনিসের ধ্বংস অনিবার্য,তেমনি ভাবে প্রহরী ছাড়া কোন জিনিস নষ্ট হতে বাধ্য ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই থিসিসের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশই নেতৃত্ব সংকটে ভুগছে। কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও সামরিক শাসন, আবার কোথাও নামমাত্র গণতন্ত্র চালু আছে, কিন্তু সেগুলো প্রকৃত ইসলামী আদর্শভিত্তিক শাসন নয়। মুসলিম জনগণ একদিকে ইসলামকে অনুসরণ করতে চায়, অন্যদিকে প্রাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বন্দী। এই দ্বন্দ্ব বাস্তবিক ও মর্মান্তিক।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও বিজয়ের পর তাদের দমন করা হয়েছে (যেমন: মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন)। এতে প্রশ্ন উঠেছে, গণতন্ত্র কি আসলেই ন্যায়ের পক্ষপাতী, নাকি এটি পশ্চিমা স্বার্থে ব্যবহৃত একটি উপকরণ ।
বর্তমানে “মানবাধিকার”, “নারীর স্বাধীনতা”, “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” ইত্যাদি ধারণাগুলোকে গণতন্ত্রের নামে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে, যা অনেক সময় ইসলামী বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। যেমন: সমকামী অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, শরিয়াহ বিরোধিতা ইত্যাদি।
বর্তমান তরুণ সমাজ গণতন্ত্রকে কখনো মুক্তির পথ হিসেবে দেখে, আবার ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাকে “র‍্যাডিক্যাল” হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় মিডিয়া ও শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই অবস্থায় থিসিসটি একটি স্পষ্টতা দেবে—আসলে ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ কী? গণতন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক কেমন?

আধুনিক দুনিয়ায় ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই পূর্ণাঙ্গতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক আদর্শ—খেলাফত বা শূরা ভিত্তিক শাসন—সম্বন্ধে গভীর গবেষণা অপরিহার্য, যা এই থিসিসে করা হবে।

এই থিসিসে বিষয় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নোত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
প্রথমত, ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান কি?
দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র ও ইসলামের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুলো কি?
তৃতীয়তঃ মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত কেন?
চতুর্থত, সার্বভৌমত্ব কার এবং সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নাকি আল্লাহ ?

এই থিসিস টি লেখা হয়েছে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় তথ্য উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। এখানে ব্যবহৃত প্রাইমারি তথ্য উপাত্ত গুলো কিছু মৌলিক গ্রন্থ এবং অনলাইনের কিছু আর্টিকেল,কিছু বই এর পিডিএফ থেকে সংগ্রহ করা । যেমন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী(রহ.) এর মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত,ঈমান ও বস্তুবাদ এর সংঘাত, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর বিখ্যাত গ্রন্থ আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক এর বাংলা অনুবাদ খেলাফত ও রাজতন্ত্র, ড. হাফিজুর রহমানের ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্র ধারণা, মোহাম্মদ এ আর খান এর মুসলমানের জীবন ব্যবস্থা -ইসলাম নাকি গণতন্ত্র ইত্যাদি অন্যতম ।
এছাড়া এই থিসিসে ব্যবহৃত তথ্যের বিরাট একটি অংশ বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের নিয়ে লেখা বই, থিসিস, জার্নাল, জীবনী গ্রন্থ ইত্যাদি থেকেও সংগ্রহ করা।
থিসিস টি একটি ভূমিকা, আট টি মূল অধ্যায় এবং একটি ফলাফল অধ্যায় এ বিভক্ত। ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে মৌলিক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে পুরো থিসিস জুড়েই। সর্বশেষ আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণার কিছু অনুসন্ধান এবং ফলাফল সম্পর্কে।

আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে এই থিসিস পেপারটি আমাকে লেখার তৌফিক দান করেছেন বলে,আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা এমন বিষয় আমার আমার সামনে রেখেছেন এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রহমতে তা নির্বাচন করতে পেরেছি ।সম্মানিত ওস্তাদ গণের নিকট দু''আর দরখাস্ত রইল ।

প্রথম অধ্যায় - ইসলাম ও রাষ্ট্র

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র

রাসূল (সাঃ) এর আগমনের সময় আরব ছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুই বড় সাম্রাজ্য রোমান ও পারসিকদের মাঝে অনেকটা বিচ্ছিন্ন একটি উপদ্বীপ। আরবদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মিশ্র প্রকৃতির। রাজনৈতিকভাবে আরবে ছিল গোত্র কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। মক্কায় বেশ কয়েকটি নগর রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হয়েছিল। জনাব হামিদুল্লাহ উল্লেখ করেন —-''তাদের নগর রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ট্রেজারি, আর্মি, ইবাদত খানা (কাবা),বিচার বিভাগ ও বৈদেশিক সম্পর্কের মতো ২৫ টি রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল।

কুরাইশ গোত্র মক্কার শাসন কার্য পরিচালনা করত। এস্পোসিতোর মতে-– "আরব বড় দুটি সভ্যতা থেকে দূরে থাকলেও নিজেরা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এর জনগণ ছিল সচেতন ;অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করত এবং এই অঞ্চলে বেশ প্রভাব রাখতো। "
তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সব জায়গায় ছিল ব্যাপক বৈষম্য। নৈতিকতার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সেখানে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এক অর্থনৈতিক অসমতা বিদ্যমান ছিল। দাসত্ব ছিলো খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। অর্থের বিনিময়ে মানুষ কেনাবেচা হতো। কুরআন এই সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবুয়াতের প্রথম সময়গুলোতে রাসূল (স:) রাষ্ট্র গঠন নয় বরং একটি সমাজ গঠনের জন্য কাজ করেছেন। তাওহিদ তথা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস ছিল এই সমাজের সদস্য হওয়ার প্রথম ধাপ।
মদিনায় নবীজির হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর এই হিজরতটি ছিল মদিনা বাসীদের সাথে দুটি চুক্তির ফল । চুক্তি দুটি 'বাইয়্যাহ আল আকাবা' কিংবা 'আকাবার শপথ' নামে পরিচিত। মদিনা মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার পেছনে এই চুক্তি দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক, আত তাবারির গ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। গোত্রগুলোর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানের শব্দগুলো সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয়, তিনি নিছক মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামষ্টিক নিরাপত্তা বা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নয় বরং একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই আহ্বান জানিয়েছিলেন ।

পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে আউস ও খাজরাজ গোত্রের কিছু লোক রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আসেন। তারা তাকে গ্রহণে সম্মত হন। মক্কায় আসা এই গোত্রের লোকজন আকাবায় মিলিত হয়ে একটি শপথ গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম শপথের বাক্যগুলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন___

১। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা

২। চুরি না করা

৩। ব্যভিচার না করা

৪। সন্তান হত্যা না করা

৫। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ না রটানো এবং

৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন ভালো কাজে বিরোধিতা না করা।

আকাবার প্রথম বাইয়াতের শব্দগুলো পড়লে স্পষ্ট হবে, এই ওয়াদা ছিল মূলত তাওহীদ ও নৈতিক বিষয়ে কিছু অঙ্গীকারনামা যেখানে রাজনৈতিক কিংবা কর্তৃত্বশীল কিছু ছিল না। কিন্তু আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের শব্দগুলো ছিল বিশেষভাবে রাজনৈতিক-যাকে 'যুদ্ধের জন্য বাইয়াত(Pledge of War) বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন।

মদিনায় হিজরতের পরই রাসূল (সা:) মদিনাবাসীদের সাথে একটি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি সম্পন্ন হল। এই চুক্তিটিই ছিল আলোচিত "মদিনা সনদ"। মদিনা সনদ কে রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। এই চুক্তিটিকে বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব "সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি" এর সাথেও তুলনা করা যায় । এই চুক্তিটি ইসলামের রাষ্ট্র ধারনা কিংবা ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রতত্ত্ব বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এসপোসিত উল্লেখ করেন,

"নবীজীর হিজরতের বিষয়টি তার ও সাহাবীদের জীবনে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করে। এখন তারা ছোট কোন গ্রুপ বা মক্কার নির্যাতিত কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়। (বরং) তারা এখন বিশ্বাসীদের একটি সার্বভৌম ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তি;যারা মরুউদ্যান কে নিয়ন্ত্রণ করে। ৬২২ সালে মুহম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের উত্থান হয়েছিল। এই কারণেই ইসলামি সাল (হিজরী সাল) এ বছর থেকেই শুরু হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, মদিনা সনদ এর মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (Authority) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সনদের অংশ হিসেবে মদিনার নাগরিক পুরো দুনিয়ার নাগরিকদের থেকে আলাদা একটি কমিউনিটিতে পরিণত হয়। আধুনিক অর্থে মদিনা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল।

মদিনা সনদে নাগরিকদের নানান অধিকার প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি গোত্রগুলোও তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে (আধুনিক অর্থে স্থানীয় সরকার) হিসেবে কাজ চালিয়ে যায়। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজের এলাকায় একসাথে বসবাস করত এই অর্থে এগুলোকে (বর্তমানের আঞ্চলিক কিংবা জেলা প্রশাসনের) সাথে তুলনা করা সম্ভব। প্রত্যেক গোত্রে একজন গোত্রপতি একজন সহকারি গোত্রপতি থাকত। গোত্রপতিদের 'নকিব' সহকারীদের 'আরিফ' এবং মিটিং করার জায়গা কে ''সাফাকাহ' হিসেবে নামকরণ করা হতো।
মদিনা সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা এর জনগণের একটি নৈতিক মান ও নির্ধারিত করা হয় । নগর এর নাম পরিবর্তন হয়ে ইয়াসরিব থেকে মদিনা করা হয়েছিল। এই চুক্তির পর রাসূল (সা:) ধীরে ধীরে মদিনাকে বিশ্বের ইতিহাসে একটি শক্তিশালী কমিউনিটিতে পরিণত করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রাসুল (সা:) এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার কমিউনিটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিশেষত সামরিক অভিযানের চেয়ে ধর্মীয় প্রচারণা এবং রাজনৈতিক ঐক্য গঠনের মাধ্যমে। এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পুরো পশ্চিম আরব। তিনি উত্তর হেজাজ,পূর্ব আরব,ইয়েমেনের নানা গ্রুপের সংগে ফলপ্রসূ রাজনৈতিক চুক্তি করেছিলেন। তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল যাকাতভিত্তিক কল্যাণ অর্থনীতি যেখানে সুদ ছিল একেবারে নিষিদ্ধ।

রাসূল (সা:) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা:) এর খলিফা হওয়ার বিষয়টি জনমতের ভিত্তিতে বিশেষত মদিনা বাসীদের মতামতের ভিত্তিতে হয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা রাসূল (সা:) কে অনুসরণ করতেন। তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

আবু বকর রাঃ এর মৃত্যুর পর ওমর রাঃ খলিফা হয়েছিলেন। তিনি আবু বকর রাঃ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। ইবনে কাসীর এর মতে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার নাম প্রস্তাব করেন এবং জনগণ তা মেনে নেয় । উমর (রাঃ), রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ এবং ইসলামের মূলনীতি মানার ক্ষেত্রে আবু বকর (রাঃ) কে অনুসরণ করেছেন।

মৃত্যুর পূর্বে ওমর (রাঃ) ছয় সদস্যের একটি শুরা গঠন করেন। এই ছয় সদস্য একক কোন ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হতে না পারায় শুরার জ্যেষ্ঠ সদস্য আব্দুর রহমান ইবনে আউফ(রা:) মদিনার বয়োজোষ্ঠ্য এবং তুলনামূলক জ্ঞানী নাগরিকদের সাথে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শে উসমান (রা:) এর ব্যাপারে বেশি মতামত পাওয়া যায়। ফলে উসমান রাঃ ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার খেলাফতের প্রথম ছয় বছর আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এরপর তার বিরুদ্ধে আবু বকর ও ওমর রাঃ এর পথ থেকে সরে আসার অভিযোগ ওঠে। এবং এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বিশৃংখলার শুরু হয়। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীদের হাতে উসমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। উসমান (রাঃ) এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) মদিনার নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হন। খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করা হয়েছিল। আইন প্রণয়নে শরিয়াহই ছিল একমাত্র উৎস, যা সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হতো। তবে খোলাফায়ে রাশেদার এই সময়টিতে খলিফা নির্বাচনে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম ছিল না। এজন্য পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে চার খলিফা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসী ও উসমানী, এই তিন সাম্রাজ্য ছিল মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি।

প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনায় রাষ্ট্রতত্ব

উপর্যুক্ত ইসলামী শাসনের এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উত্থানের পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবেও রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে আব্বাসী শাসনের সময় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। আব্বাসীদের রাজধানী বাগদাদে মৌলিক জ্ঞান ও অনুবাদ শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পারসিক রচনাগুলোর অনুবাদের ফলে পারসিক রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং গ্রিক সাহিত্য গুলো অনুবাদের ফলে রোমানদের রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটে।

পাশাপাশি বহু মুসলিম চিন্তাবিদ এ সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মধ্যে আল-ফারাবি, আল মাওয়ার্দি,নিজামুল মুলক,ইমাম গাজালি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে খালদুন অন্যতম । এই মনীষীগণ সমসাময়িক ইসলামিক রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এসব গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, খিলাফত ও ইমাম, রাষ্ট্র ও ধর্ম, লোক প্রশাসন এবং রাষ্ট্রের শরিয়াহ আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

আল-ফারাবির রাষ্ট্র ধারনা :মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল-ফারাবি ছিলেন অন্যতম। যিনি রাষ্ট্রের দার্শনিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন। তাকে ইসলামী অথবা মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের জনক হিসেবে মনে করা হয়। মধ্যযুগের স্কলাররা তাকে অ্যারিস্টটলের পর দ্বিতীয় শিক্ষক (মুয়াল্লিমে সানি) মনে করতেন। তিনি প্রাচীন মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম, যিনি গ্রিক তত্ত্বকে মুসলিম সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। পাশাপাশি প্রাচীন রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছিলেন। ফারাবির মতে, রাজনীতি ও দর্শনের একত্রে চলা জরুরী। তিনি বলেন __"দর্শন হলো অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য জ্ঞান প্রদানে একটি তাত্ত্বিক শিল্প বা ধারা। আর রাজনীতি হলো কাজগুলো নির্ভুল করতে এবং সুখী হওয়ার জন্য পথ প্রদর্শনের একটি ধারা। তাদের অবশ্যই ঐক্য জরুরী। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ একই পর্যায়ের। দর্শন ও রাজনীতি ঐক্যের মাধ্যমে একে অপরের জরুরি জ্ঞান এবং প্রত্যাশিত আচরণ প্রদান করে "।

ফারাবির বিখ্যাত বই (on the perfect state) (আল মদিনাতুল ফাদিলা) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । পাশাপাশি মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রথম বই । এই বইতে তিনি অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান (knowledge of existence), সমাজের প্রয়োজনীয়তা, নেতার গুণাবলী , একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র এবং দুর্বল রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । ফারাবি সমাজকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: পরিপূর্ণ ও অপরিপূর্ণ। ফারাবির মতে, সেটাই পরিপূর্ণ রাষ্ট্র যার উদ্দেশ্য সুখ(Happiness) অর্জন । তার মতে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন সুখ অর্জন করতে যা চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা (The ultimate perfection) ।

তিনি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকে একটি পরিপূর্ণ মানব শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। একটি মানব শরীর কতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। শরীরকে ঠিকমত চালাতে প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের কাজ সম্পন্ন করতে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে। আত্মা হলো শরীরের নেতৃস্থানীয় অঙ্গ,যা গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। আত্মাকে তার অধীনস্থ অঙ্গগুলো সহায়তা করে এবং এই সহায়তার প্রক্রিয়া শরীরের সকল স্তর নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদন করে। সুতরাং এখানে একটি পদসোপানভিত্তিক (Hierarchical) কার্যক্রমের বিষয় রয়েছে, যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তৃক উদযাপিত। একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের শাসকও শরীরের ঠিক আত্মার মতোই। সুতরাং একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য একজন পরিপূর্ণ শাসক এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সঠিক সমন্বয় ও সহায়তা জরুরী।।

এবং তিনি বলেন, পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের বিপরীতটাই মূলত অপরিপূর্ণ রাষ্ট্র । ফারাবি বেশ কয়েক ধরনের অপরিপূর্ণ রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন মূর্খ রাষ্ট্র, প্রয়োজনমূলক রাষ্ট্র, সম্পদ বাদী রাষ্ট্র, বিলাসী রাষ্ট্র, সম্মান প্রত্যাশী রাষ্ট্র, কর্তৃত্বশীল রাষ্ট্র, সামাজিক কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, দুর্বল রাষ্ট্র, পরিবর্তনীয় রাষ্ট্র, ভুল রাষ্ট্র ইত্যাদি ।

আল মাওয়ার্দীর রাষ্ট্র ধারণা

:মাওয়ার্দির মতে, নেতৃত্ব হলো দুটি গ্রুপ তথা নেতা ও জনগণের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। মাওয়ার্দী নেতৃত্বের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেমন নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং ইসলামে এর মর্যাদা, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, নেতা হওয়ার শর্তসমূহ, নেতার দায়িত্ব, উত্তরাধিকার মনোনয়ন ও অপসারণ ।

ইমামত বা নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা নবী (সা:) এর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনকে সংরক্ষণ এবং দুনিয়ার কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনায় কাজ করে। এটা শরিয়াহ ও যুক্তি-বাস্তবতা(Rational) উভয় জায়গা থেকেই জরুরি বিষয় ।

শরিয়াহর বিষয় এজন্য, কারণ এটা শরিয়াহর বিষয়সমূহকে পরিচালনা করে। আর যুক্তির বিষয় এজন্য, কারণ শাসন(সরকার) একটি প্রাকৃতিকভাবে জরুরি বিষয়,যাতে মানুষ অবিচার কিংবা এ ধরনের নানা বিষয়ে শাসকের কাছেই নিজেকে সোপর্দ করে। আর সরকার ছাড়া বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং বর্বর আচরণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

ইমামত বা নেতৃত্ব এমন একটি বিষয়, যা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। মুসলমানদের জন্য ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা সামষ্টিক দায়িত্ব। তিনি বলেন নেতৃত্বের জন্য ৭টি শর্ত রয়েছে।

১। সকল শর্তসহ ন্যায় বিচার

২। ইজতেহাদ করার মত জ্ঞান

৩। সুস্বাস্থ্য

৪। পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

৫। মানুষকে সংগঠিত করা এবং প্রশাসন চালানোর মতো পরীক্ষিত সক্ষমতা

৬। সাহসিকতা

৭। কুরাইশ পরিবার থেকে হওয়া

এই ৭টি গুণের পাশাপাশি আরেকটি গুণ থাকা আবশ্যক - জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হওয়া ।

ইমামের বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আল মাওয়ার্দী ১০ টি বাধ্যতামূলক দায়িত্বের কথাও তুলে ধরেছেন।

নিজামুল মুলকের রাষ্ট্র ধারণা :

নিজামুল মুলক সেলজুক সাম্রাজ্যের দুজন প্রভাবশালী সুলতান আলপ আরসলান ও মালিক শাহর সময়ে উজিরে আজমের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজামুল মুলক সিয়াসেতনামা (আরবি উচ্চারণ) নামক বই লিখেন যার বাংলা অর্থ দাড়ায় "রাজনীতিনামা "।

একজন বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নিজামুল মুলকের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা খুবই সমৃদ্ধ ছিল। তার মতে রাজত্ব হলো ধর্ম (ধর্মীয় বিষয়) ও দুনিয়ার (ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াদি) সমন্বয়। প্রত্যেক যুগে স্রষ্টা একজন রাজা বাছাই করেন, যার দুনিয়ার বিষয়াদি পরিচালনা করার মত অসামান্য গুণাবলী থাকে। রাজা দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। আল্লাহ তাকে এমন কিছু গুণ দান করেন, যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার নেতৃত্ব মানুষের জীবনকে করে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। তিনি আইন অমান্যকারীর শাস্তি নিশ্চিত করেন। যথার্থভাবে প্রশাসন চালানোর জন্য যোগ্য মানুষদের মধ্য থেকে উজির ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। মানুষের জন্য সর্বদা শুভ কামনা করেন। মোটকথা, তার রাষ্ট্রটি অত্যাচারী রাষ্ট্র হয় না।

ইমাম গাজ্জালীর রাষ্ট্র ধারণা :

ইমাম গাজ্জালী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে বিশেষত আব্বাসী ও সেলজুকদের সময়ে একজন সুবিখ্যাত স্কলার। জন্ম ১০৫৮ সালে ইরানে। ইমাম আল হারামাইন খ্যাত প্রখ্যাত আলিম আল জুয়াইনির অধীনে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১০৯১ সালে নিজামুল মুলক কর্তৃক বাগদাদের বিখ্যাত স্কলার তৈরির প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় নিজামিয়ার প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান । মাদ্রাসায় নিজামিয়ায় তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রের উপর লেকচার দিতেন এবং মানুষের ইসলাম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর দিতেন। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখেন। রাজনীতি বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কিতাব আল মুজতাজহিরি, এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিইন, নাসিহাতুল মুলক, আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ ইত্যাদি । এসব গ্রন্থে তিনি ইমামত ও সালতানাত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। **কিতাব আল মুজতাজহিরি** বইটি তার লেখা রাজনীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ । গাজ্জালীর মতে, প্রত্যেক যুগেই একজন ইমাম জরুরী এবং মুসলমানদের উচিত এই বিষয়ে একমত হওয়া। ইমাম গাজ্জালী ইমামতের গুরত্বের সম্পর্কে দুটো নির্দিষ্ট বিষয় সামনে এনেছেন।

১। ঐতিহাসিক কারণ : রাসূল সাঃ এর মৃত্যুর পর ইমাম নিয়োগের প্রশ্নে সাহাবীদের তাড়াহুড়ো করা।

২। মুসলমানদের দুনিয়াবী বাস্তবতা : শত্রুর হাত থেকে প্রতিরোধ এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখা নিঃসন্দেহে ইসলামে বড় বিষয়। পাশাপাশি মুসলমানদের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্যও একজন পাহারাদার দরকার, না হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

ইমাম গাজ্জালী ইমামদের ১০ টি গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। এবং তার মতে ইমামের দায়িত্ব দুই ধরনের। প্রথমত,ইলম তথা জ্ঞান অর্জন। দ্বিতীয়ত, আমল তথা কাজ সম্পাদন। আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ গ্রন্থে তিনি যুক্তি তুলে ধরেন, রাষ্ট্র - যুক্তির (Reason) কারণে নয়; বরং ধর্মীয় কারণে জরুরী ।

তবে বিস্তারিত বর্ণনায় গাজ্জালী দ্বীন ও দুনিয়া দুটি প্রয়োজনেই রাষ্ট্র জরুরী বলে উল্লেখ করেন। যেমনটা গাজ্জালী বর্ণনা করেছেন :

'মহান আল্লাহ আমাদের আখেরাতের বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, যা মূলত নবী মুহাম্মদ (সা:) এর উদ্দেশ্যে ছিল। এই আদেশ একজন নেতার মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। ফলে তিনি একজন নেতা ঠিক করে দিয়েছেন। যাকে আনুগত্য করতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, যা একজন নেতার মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে। ফলে তিনি একজন নেতা ঠিক করে দিয়েছেন যাকে আনুগত্য করতে হবে ।

গাজ্জালী এ বিষয়ে অন্য এক আলোচনায় উল্লেখ করেন,

'ধর্ম (দ্বীন) ও কর্তৃত্ব (সালতানাত) হলো সহোদর ভাইয়ের মতো । যেখানে ধর্ম হলো ভিত্তি আর সুলতান এটার পাহারাদার । ভিত্তি ছাড়া যে কোন বিষয় ধ্বসে যাবে, আর পাহারাদার ছাড়া যে কোন বিষয় চুরি হবে ''।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রাষ্ট্র ধারণা:

ইবনে তাইমিয়ার লেখালেখির সময়কাল ছিল গাজ্জালীর দুই শত বছর পর। তিনি একাধারে বড় মাপের আলেম, হাম্বলী ফিকহ বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক নেতা ও ছিলেন। তিনি বিশেষ করে রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ শরীয়তি রাষ্ট্র ব্যবস্থা (আস-সিয়াসাত আশ-শারিয়াহ) ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া শাসকের প্রয়োজনীয়তা এবং শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন শরিয়াহর আলোকে সর্বোত্তম শাসক নিয়োগের মূলনীতি নিয়ে। পাশাপাশি শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ট্রেজারি (বাইতুল মাল) পরিচালনা, শরয়ী আইন, শূরা ও ধর্ম রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা মূলত সূরা আন নিসার ৫৮ ও ৫৯ নম্বর আয়াতের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন, তা কতইনা উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তাহলে আল্লাহর অনুগত হও, রসূল(সা:) ও তোমাদের নেত্রী বর্গ ওলামাদের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের(সা:) দিকে ফিরিয়ে দাও। এটি হলো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর ''।

এই দুই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইমাম তাইমিয়া রাষ্ট্রের দুটো উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন _

1. সত্যবাদিতা (আমানত) ও
2. ন্যায়বিচার (আদালত)

তিনি নেতৃত্বের ধর্মীয় মর্যাদা কিংবা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য রাসূল (সা:) এর সেই হাদিসটিকে সামনে আনেন ___

"যদি তিনজন ব্যক্তিও সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে একজনকে যেন নেতা নির্বাচিত করা হয়।"

ইবনে তাইমিয়ার মতে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। নেতা (ইমাম) দুনিয়াতে আল্লাহর ছায়া। সুতরাং শাসককে তার কাজের ব্যাপারে আখিরাতের শক্ত জবাবদিহি করতে হবে। নামাজের ইমামতি করার ক্ষেত্রে যে গুণাগুণ দেখা হয়, ইবনে তাইমিয়া সেগুলো শাসকের ক্ষেত্রেও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের

প্রশাসনে যোগ্য মানব সম্পদ নিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। সকল শাসকের জন্যই জরুরি বিষয় হল, তিনি সকল পর্যায়ে যোগ্য লোক নিয়োগ দিবেন ।
ইবনে তাইমিয়া রাষ্ট্রের জন্য শূরা কে অত্যাবশ্যকীয় একটি পরিষদ হিসেবে মত দেন।

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র ধারণা :

ইবনে খালদুন একজন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক, যিনি ইতিহাসকে স্বতন্ত্র একটি জ্ঞানের ধারা হিসেবে উন্নীত করার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
ইবনে খালদুন রাষ্ট্র সম্পর্কে তত্ত্বগুলো আল মোকাদ্দিমা এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। এই দুই অধ্যায়ে তিনি মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেছেন __
১। একটি সমাজ কেন এবং কিভাবে গঠিত হয়
২। একটি রাষ্ট্র শক্তির উত্থান ও পতন কিভাবে হয় এবং
৩। রাষ্ট্রে ধর্মের প্রভাব এবং খেলাফত ও ইমামত নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি।
রাষ্ট্র সম্পর্কে তার সর্বাধিক পরিচিত তত্ত্বের নাম আসাবিয়্যাহ কিংবা গোষ্ঠী তত্ত্ব।
আসাবিয়্যাহ (Asabiyyah) শব্দটি একাডেমিয়াতে নানা অর্থে অনূদিত ও ব্যবহারিত হয়েছে । যেমন: গোত্রপ্রীতি, সংহতি, রক্ত-সম্পর্ক, সামাজিক সংহতি, সামষ্টিক অনুভূতি (Group Feeling) ইত্যাদি ।
ইবনে খালদুনের মতে বৃহৎ পরিসরে রাষ্ট্র বর্ধিতকরণের জন্য ধর্ম একটি জরুরী বিষয়। আসাবিয়্যাহর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু এর সীমানা বড় করার জন্য ধর্ম জরুরী। ধর্মীয় আসাবিয়্যাহ হল সবচেয়ে শক্তিশালী আসাবিয়্যাহ ।
ইবনে খালদুনের মতে, খেলাফত হলো ধর্মকে সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োগের নাম।

মূল্যায়ন :

সুতরাং আল ফারাবি থেকে ইবনে খালদুন পর্যন্ত মুসলমানদের সমৃদ্ধ একটি রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক দিক পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট বর্ণিত যে, ছয় জনই ছিলেন তাদের সময়ের সেরা দার্শনিক, যারা ইসলামি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের তত্ত্বের কথা বলেছেন। যদিও তাদের মতামত ছিল একজন থেকে অপরজনের ভিন্ন। তবে তারা সবাই একমত ছিলেন যে, একজন শাসক (নেতা, ইমাম) সর্বদা জরুরী।

হে মুসলিম, আপনার জীবনব্যবস্থা কী?

জীবনব্যবস্থা বলতে বোঝায় এমন একটি পূর্ণ কাঠামো। যার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়। ইসলাম কি শুধুই মসজিদ? আর মসজিদের বাইরের জীবন কি পাশ্চাত্যের নিয়মে চলবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

(সূরা আল-মায়েদা: ৩)

ইসলাম শুধুমাত্র ইবাদতের ধর্ম নয়। এটি একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালাও নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম বলে দেয় কীভাবে ব্যবসা করতে হবে, কীভাবে বিচার করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ ও শান্তি কায়েম করতে হবে। এমনকি শাসকেরও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম।

আজ মুসলিমরা ব্যক্তিজীবনে ইসলাম পালন করে কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে সেক্যুলার। নামায মসজিদে, কিন্তু রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ও অর্থনীতি চলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। ইসলামের নাম নেয়া হয়, কিন্তু আইন পাশ হয় মানুষের ইচ্ছায়, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নয় ।

অথচ, জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা না হলে, সেই 'ইসলাম' অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কেন আমরা বিভ্রান্ত?

কারণ, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম হলো ব্যক্তিগত। রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি এগুলো ধর্মবিহীন হবে — এটাই আধুনিকতা! আর আমরা মুসলমান নামধারীরা তা মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধানকে শুধু মসজিদে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি।

- ব্যক্তিজীবনে শুধু নামায নয়, **চরিত্রে ইসলাম** থাকতে হবে।
- পারিবারিক জীবনে শুধু বিয়ে নয়, **পরিবার গঠনে ইসলাম** থাকতে হবে।
- সমাজে শুধু খতনা নয়, **ইনসাফ, আদল, পর্দা, শালীনতা** থাকতে হবে।
- রাষ্ট্রে শুধু আজান নয়, **শরিয়াহর শাসন** থাকতে হবে।

ডক্টর ইকবাল পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা করে বলেছিলেন, তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন এবং উপলব্ধি করতেন যে এমন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য

যেখানে ইসলামী জীবনের অনুশীলন তার সমস্ত শাখা ও দিক সমেত জারি থাকবে। এবং ইসলামী শরিয়াহ ও জীবনের ইসলামী ব্যবস্থা নিজের সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সক্ষমতা ও সারসত্যকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে ।

তিনি ইসলামী সভ্যতার শাশ্বত শক্তি এবং ইসলামী আইন, একটি নতুন দুনিয়া, নতুন সমাজ গঠন ও বিনির্মাণে এর বিশাল সম্ভাবনার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন । **১৯৩২** সালে অল মুসলিম পার্টির কনফারেন্স এর সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন,

“তোমরা যে দ্বীনের পতাকা বাহি সেই দ্বীন ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে, স্বীকৃতি দেয়, এবং তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে যে সে সবকিছু আল্লাহ ও তার বান্দাদের জন্য ব্যয় করে দেয়। এই দ্বীনের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এই দ্বীন এখনো একটি নতুন পৃথিবী তৈরি করতে সক্ষম, যেখানে গরিবরা ধনীদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারে, যেখানে মানব সমাজ গড়ে ওঠে আত্মার সমতার ওপর, উদরের সমতার ওপর নয় ।”

ইসলামি রাষ্ট্র ধারণার বিকাশ

আঠারো শতাব্দী থেকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ব্রিটিশ, ফ্রান্স, ডাচ, রাশিয়া ও ইতালি মুসলিম বিশ্বের বড় অংশের দখল নিয়ে নেয় । অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের তখনকার সময়ে বড় এক শক্তি উসমানিরা তাদের সীমানার বিশাল অংশ হারায় ;বিশেষত বালকান, ইউরেশিয়া ও আফ্রিকায়। অবশ্য তখনও তারা মুসলিম বিশ্বের একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে বিদ্যমান এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে মুক্ত ছিল।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধ গ্রুপ জেগে উঠে। এ সকল প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শের আলোকে সমন্বয় করতে একাডেমিক কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়। তাদের উদ্যোগগুলো মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল ;

১। মুসলিম ভূমি গুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে মুক্ত

২। উসমানী খিলাফত কে বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা ।

এক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী অবদান রেখেছেন, যাদের মধ্যে জামাল উদ্দিন আফগানি ছিলেন অন্যতম।

মুসলিম বিশ্বে তখন পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে ইউরোপের আলোকায়নের ধারণা এবং ফরাসি বিপ্লব সব জায়গায় নাড়া দিয়েছিল।উসমানী সুলতানরা তাদের চাপে আধুনিকতার অংশ হিসেবে এবং পশ্চিমা মডেলের আদলে বেশ কিছু সংস্কার করেন। ব্ল্যাক এর মতে _

'১৮ শতকের শেষদিকে এবং ১৯ শতকের শুরুতে যখন মিশর ও গ্রীস হাতছাড়া হলো,তখন অবস্থার অবনতি হয় –যা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত এবং বুদ্ধিজীবীদের চিন্তিত করে। ইউরোপ এর যুদ্ধে সফলতা, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ইউরোপের আইন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির উন্নয়নের পেছনে ভূমিকা পালন করে ''।

১৮৩৯ সালে উসমানি খিলাফতে প্রথমবারের মতো ফ্রান্স মডেলে একটি বড় ধরনের সংস্কার আনা হয়েছিল, যা তানজিমাত নামে পরিচিত।

১৮৭৬ সালের সংবিধান উসমানি খেলাফতকে লিবারেলিজমের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। সংবিধানের শুরুতে এমন একটি বর্ণনা ছিল —-

"এই সংবিধান বর্ণনা করছেন, সাম্রাজ্যের (সালতানাতের) সকল বিষয় কোন ধরনের পার্থক্য করন ছাড়া (বিশেষত) ধর্ম যা-ই হোক না কেন, উসমানি (সালতানাতের নাগরিক) হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

সুলতান আব্দুল হামিদ খান ছিলেন শেষ দিকের ওসমানী সুলতানদের মধ্যে অন্যতম। উসমানী -রাশিয়া যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) এবং বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) যা রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ও সার্বিয়াকে উসমানী থেকে আলাদা করেছিল। এগুলোর পর উসমানী খিলাফত আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে পুরোপুরি ইসলামীকরণের দিকে ফিরেছিল। আব্দুল হামিদ খান তার শাসনের ভিত্তি হিসেবে সুন্নি মুসলিম ও প্যান ইসলামীজমকে গ্রহণ করেছিলেন ।

সুলতান আব্দুল হামিদ খান হানাফি ফিকহ ভিত্তিক সুন্নি মুসলিমদের সাথে ঐক্য সুদৃঢ় করার দিকে মনোযোগ দেন।

আব্দুল হামিদ খান তার এক বক্তব্যে বলেন _

"ইসলামে গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। পশ্চিমাদের এটা দরকার। কেননা, তাদের (সমাজে) সমতা নেই.. পশ্চিমাদের মতো শ্রেণী বৈষম্য ইসলামে নেই... পশ্চিমারা ন্যায়বিচার খোঁজে আইনের মাধ্যমে ;যেখানে ইসলামে এটি পাওয়া যায় বিশ্বাসে (ঈমানে)"

পরবর্তীতে বালকান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে খিলাফতের শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বলতার দিকে চলে আসে। এর কয়েক বছর পর মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক মুসলিম বিশ্বে প্রথম সেকুল্যার রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। **আনুষ্ঠানিকভাবে পতন হয়**

উসমানী খিলাফতের। খিলাফতের পতনের পর আরব বিশ্বে ''আরববাদ' নামে এক নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা যায়।

উসমানীদের পতনের পর ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বের রাষ্ট্র ধারণায় নানা অ্যাপ্রোচ সামনে আসে। নতুন রাষ্ট্র তৈরীর লক্ষ্যে বিশ্বের অনেক স্কলার সেকুলারিজম কে সমর্থন দেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় - গণতন্ত্র

■ উৎপত্তি ও সংজ্ঞা

গণতন্ত্র (Democracy) শব্দটি গ্রিক শব্দ ‘Demos’ (জনগণ) ও ‘Kratos’ (ক্ষমতা/শাসন) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দাঁড়ায় 'জনগণের শাসন' বা 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা'।

গণতন্ত্র এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তারা সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

সংজ্ঞা:

আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে:

“Government of the people, by the people, for the people.”

অর্থাৎ, 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, এবং জনগণের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত।'

অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে দেখেছেন জনসাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকাকে কেন্দ্র করে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, গণতন্ত্রকে সাধারণত এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়:

'A system of government in which power is vested in the people, who rule either directly or through freely elected representatives.'

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্তঃ

১. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy): জনগণ সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে।

২. পরোক্ষ বা প্রতিনিধি গণতন্ত্র (Representative Democracy): জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা তাদের হয়ে আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

■ গণতন্ত্রের বিভিন্ন মডেল

- সরাসরি গণতন্ত্র (Direct Democracy): এখানে জনগণ সরাসরি আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে এই পদ্ধতি ব্যবহার হতো।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy): জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা পার্লামেন্ট বা সংসদে গিয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করে।

- উদার গণতন্ত্র (Liberal Democracy): এতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আইনশাসনের ন্যায্যতা বজায় থাকে।
- সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy): এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা যেমন সাম্য, সম্পদের সমবন্টন ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy): রাষ্ট্রধর্ম নেই এবং সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা হয়।

■ আধুনিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

আধুনিক গণতন্ত্রের সূচনা মূলত ইউরোপে হয়েছিল ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে, যেখানে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।

- ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫): এটি ছিল এক ঐতিহাসিক দলিল যা রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম: রাজতন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়।
- আমেরিকান স্বাধীনতা (১৭৭৬): স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম হয়।
- ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯): *Liberty, Equality, Fraternity* স্লোগানে জনগণের জন্য সরকার গঠনের ধারণা বিস্তৃত হয়।
- ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলন: ২০শ শতকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো গণতান্ত্রিক ধারায় নিজস্ব সরকার গঠন করে।
- জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সনদ: বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।

■ বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ইসলাম

গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিককে যেকোনো ধর্ম গ্রহণ বা ত্যাগ করার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামে বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত।

“ধর্ম বিষয়ে জবরদস্তি নেই।” (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:২৫৬)

এই আয়াত ইসলামে বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ না করার নির্দেশ দেয়।

তবে ইসলাম পরিস্কার করে দেয় যে, একজন মুসলমানের জন্য ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯)
বিশ্বাসের স্বাধীনতা বলতে ইসলাম বোঝায় সত্য গ্রহণের স্বাধীনতা; কিন্তু সত্য গ্রহণের পর তা অস্বীকার করলে পরিণতি আছে।

■ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ইসলাম

গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয়, ব্যক্তি যা ইচ্ছা করতে পারে যতক্ষণ না তা অন্যের ক্ষতি করছে। ইসলাম এই ধারণাকে শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করে। ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মঞ্জুর করে, কিন্তু তা আল্লাহর শরীয়াহর সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করলে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এটা তার অধিকার হলেও, ইসলামে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

■ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ইসলাম

গণতন্ত্রে যেকোনো মত প্রকাশ করা বৈধ, এমনকি ধর্ম বা নবীর বিরুদ্ধেও। কিন্তু ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে সীমারেখার মধ্যে।
"হে মুমিনগণ! এমন কথা বলো না যা নিজেদের ক্ষতির কারণ হয়।" (সূরা আহযাব, ৩৩:৭০)
"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)
অতএব, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, তবে তা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে হতে হবে।

■ মালিকানার স্বাধীনতা ও ইসলাম

গণতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। ইসলামও মালিকানার অধিকারকে সম্মান করে, তবে সীমারেখা নির্ধারণ করে।
"মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" (সূরা বাকারাহ, ২:১৮৮)
ব্যক্তি তার সম্পদের মালিক, কিন্তু সে তা হারাম পথে ব্যবহার করতে পারে না। যাকাত, উত্তরাধিকার, সুদ নিষেধ—সবই মালিকানার ব্যবস্থাপনার ইসলামি নির্দেশনা।

■ সার্বভৌমত্ব জনগণের নাকি আল্লাহর?

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে—তারা আইন প্রণয়ন করে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।

"ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ, ১২:৪০)

"তিনি শরীয়ত দিয়েছেন তোমাদের জন্য।" (সূরা আশ-শূরা, ৪২:১৩)

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন: "যে শরীয়ত আল্লাহ দেননি তা মানা শিরক ও বিদআত।"

■ সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নাকি আল্লাহ?

গণতন্ত্র বলে, "Power belongs to the people." ইসলাম বলে, "Power belongs to Allah."

"সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:২৬)

রাসূল (সা.) বলেন: "যে আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া শাসন করে, সে কাফির।" (সূরা মায়িদাহ, ৫:৪৪)

সুতরাং, ইসলামে জনগণ আইন প্রণেতা নয়; বরং তারা শরীয়তের অধীনে চালিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায় - ইসলাম ও রাজনীতি

■ নস (আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ) এবং শূরা (পরামর্শ):

ইসলামী প্রেক্ষাপটের রাষ্ট্র আলোচনায় ঘানুসি মনে করেন, ইসলামে শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং প্রাকৃতিকভাবে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা । তিনি দার্শনিক ইকবাল থেকে উদ্ধৃতি করেন__

'আপনি এক দিক থেকে তাকালে ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে দেখতে পারেন, আর অপরদিকে একটি রাষ্ট্র ''।

ঘানুসির মতে, ইসলামি রাষ্ট্রের দুটি আবশ্যিক মূলনীতি রয়েছে :

ক.নস (টেক্সট)

খ.শূরা ।

ইসলামী রাজনীতির মূল ভিত্তি হল নস, যা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ। এগুলোই রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাথমিক নির্দেশনা। ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া মূলত এই নস-এর ভিত্তিতেই চলে।

ঘানুসির মতে, ইসলামী সরকার তথা কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক উৎস এর টেস্ট সমূহ। অর্থাৎ ওহির মাধ্যমে পাওয়া উৎস সমূহ –কোরআন ও হাদিস

তিনি উল্লেখ করেন, অন্য কোন আইন এই আইনের উপর সুপ্রিম হতে পারে না। এবং কোন ধরনের বিতর্ক ছড়ায় আল্লাহর আইনই সার্বভৌম। আল্লাহর অথরিটির উপর কোন কর্তৃত্বশীল অথরিটি নেই।

ঘানুসির মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো শূরা। যা টেক্সটের পরেই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি তার বই 'ইসলামী রাষ্ট্রের জনস্বাধীনতা' বইয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশেই লিখেছেন শুরার উপরে । আলোচনার শুরুতেই তিনি কুরআন ও হাদিসের কিছু রেফারেন্স সামনে এনেছেন, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সা:) মুমিনদের সকল কাজ শূরার মাধ্যমে সম্পন্ন করার আদেশ দিচ্ছেন।

'কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন''।

কুরআন ও সুন্নাহ মুসলিম রাষ্ট্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, জনগণের কল্যাণ এবং ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

"তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।" (সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮)

এটি শূরা বা পরামর্শের গুরুত্ব প্রমাণ করে, যা থেকে বোঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা ও সুন্নাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শূরার (পরামর্শের) মাধ্যমে জনগণের মতামত ও আলেমদের অভিজ্ঞতা গুরুত্ব পায়, তবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত শরীয়াহ ভিত্তিক হয়ে থাকে।

সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মনোনীত দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গের আনুগত্য কর ''। (সূরা নিসা :৫৯)

ঘানুসি পরবর্তী সময়ে শূরা ও ইজমার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, রাসুল (সা:) তাঁর জীবদ্দশায় খলিফা ঘোষণা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবীরা আবু বকর (রা:)কে ইজমার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। শুধুমাত্র এ ঘটনায় নয়, আরো অনেক সময় 'ইজমা' বিরোধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মূলত, খিলাফত ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পারস্যের আদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত করেছিল। ইসলামের প্রথম যুগে নানা বিষয়ের সমাধানে ইজমা ছিল সমাজের মৌলিক ভিত্তি, বিশেষত যেখানে টেক্সটে(নস) কোন স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া না যেত ।

■ শূরা ও ইজমার ধারণা :

শূরা হলো পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি, যেখানে সমাজের অভিজ্ঞ আলেমরা একত্রিত হয়ে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করেন। এটি সমাজে শাসকের নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে সহায়তা করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এছাড়া, ইজমা হলো ইসলামী উলামাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা ইসলামী শরীয়ত এবং সমাজের জন্য প্রযোজ্য। ইজমা কোনো একটি সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

"যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা নিসা, ৪:৫৯)।

শূরা এবং ইজমার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

■ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম মানবতার কল্যাণ এবং নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা সাধন করে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন, যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"আমি সুন্দর চরিত্র পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।" (মুয়াত্তা মালিক: ১৬৩১)।
এটি ইসলামি সমাজের মূল উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলে, যেখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে, শাসকরা জনগণের কল্যাণে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য।

■ ইসলামী রাষ্ট্রে জুলুম নিরসনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মেকানিজম:

ইসলামে ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, তবে এটি কেবল তখনই অনুমোদিত হয় যখন তা সমাজের শৃঙ্খলা এবং অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন না করে। ইসলামী রাষ্ট্রে, শাসকরা যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে অত্যাচার বা জুলুম করে, তবে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।
রাসূল (সা.) বলেছেন:
"তুমি যদি কোনো জুলুম দেখে, সেটিকে হাত দিয়ে প্রতিহত করো, যদি তা না পারো, তবে মুখ দিয়ে প্রতিহত করো।" (মুসলিম: ৪৯)।
এই হাদীসটি ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্ব এবং জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাষ্ট্রের নীতিমালাকে সুস্পষ্ট করে।

■ বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাকে চ্যালেঞ্জ :

আজকের আধুনিক সভ্যতা ভোগবাদী চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত, যেখানে দুনিয়ার জীবন এবং ভোগের উপাদানগুলোকে মূল সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। তবে ইসলাম মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে আখিরাতকে স্থান দেয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ গণ্য করো না, বরং আখিরাতের প্রতি বেশি মনোযোগী হও।" (সূরা আনফাল, ৮:৬৭)।
এটি ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার একটি অংশ, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রা শুধু দুনিয়া কেন্দ্রিক নয়, বরং আখিরাতের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একসাথে নিশ্চিত করে।

■ নববী দাওয়াত আর সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাঝে পার্থক্য:

নববী দাওয়াত বা ইসলামী দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা। এটি কেবল দুনিয়ার

নয়, বরং আখিরাতের জন্যও কাজ করে। ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য থাকে মানবতার জন্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং পার্থিব ও পরকালীন সফলতা অর্জন।
অন্যদিকে, সংস্কারমূলক আন্দোলন সাধারণত সমাজের আধুনিকীকরণ, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সমাধানের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। নববী দাওয়াত কখনোই শুধুমাত্র সমাজের পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক অবস্থানের পরিবর্তনও লক্ষ্য রাখে।

■ আখিরাতের বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার অজ্ঞতা

কুরআন মাজীদ মানুষের অসম্পূর্ণ ভাবনার উপর বারবার চাবুক লাগাতে থাকে। মানুষ দাবী করে, এই বিশ্বের সব কিছু সে জানে। এটা নিয়ে তারা খুব গর্ব করে। অথচ তাদের সবার জন্য ও অবগতি, জ্ঞান ও মেধা একত্র করলে সেটা সাগরের এক ফোঁটা পানি এবং মরুভূমির একটি কনা পরিমান হবে না।
আধুনিক সভ্যতা যেখানে শুধু দুনিয়ার সফলতা, প্রযুক্তি এবং ভোগবাদকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে ইসলাম মানুষের আখিরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বারবার স্মরণ করায়। ইসলামের দৃষ্টিতে, আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া এবং পরকালীন জীবনের জন্য কাজ করা সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:
"তারা দুনিয়ার বাহ্যিক দিক জানে, অথচ আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফিল।" (সূরা আর-রূম, ৩০:৭)।
এটি আধুনিক সভ্যতার আখিরাতবিমুখ মনোভাবের প্রতি ইসলামিক প্রতিবাদ। ইসলামী রাষ্ট্র আখিরাতের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাজ করে।
মানুষের সীমিত ও স্বল্প জ্ঞান কখনো এমন জিনিসের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে যা প্রথম দৃষ্টিতে ভুল ও বেঠিক মনে হয়। যেটা বিবেক বিবেচনা এবং অনুভব-অনুভূতির বিপরীত ও বাইরে হয়। যেমনটা হযরত মুসা ও খিজির আলাইহিস সালাম এর ঘটনায় কোরআন মাজীদ দেখিয়ে দিয়েছে।
কখনো মানুষের সীমিত ও সামান্য দৃষ্টি শক্তি ভুল করে বসে। দূরকে কাছে,কাছে কে দূর মনে করে। অবাস্তবকে বাস্তব এবং বাস্তব কে কল্পনা কুসুম মনে করে। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে ঠিক মনে করে। মনে হওয়ার এ ভুল বনি আদম করে। করতে বাধ্য।
জুলকারনাইনের মত বিচক্ষণ মেধাবী ও শক্তিধর বাদশারও মনে হয়েছে __সূর্য যেন একটা ঘোলাটে কোয়াই ডুবছে । কুরআনে সূরা কাহাফে এর বর্ণনাও রয়েছে ___

“ (এবং পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে জুলকারনাইন গেল) যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছালো, তখন সে দেখতে পেল, সেটি এক ককর্দমাক্ত (কালো)জলাধারে অস্ত যাচ্ছে । (সূরা কাহফ:৮৬)

সুতরাং, ইসলামী রাজনীতি হল একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক জীবনব্যবস্থা যা কেবলমাত্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সমাধানই নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও পরকালীন জীবনেও একটি সফল পথের দিশা দেয়। এখানে আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শূরা, ইজমা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং আখিরাতের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, যা একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায় - ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো

ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো (Structure of the Islamic State) এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ এবং খিলাফতের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোতে গঠিত, যা মুসলমানদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলামী রাষ্ট্র হল একটি পুরোপুরি নাগরিক(Civil)রাষ্ট্র, ইসলামের সুমহান আইনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। কারজাভীর মতে,ইসলামী রাষ্ট্র আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) এবং পরামর্শের (শূরা) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

কারজাভি এ ধরনের একটি স্বপ্ন রাষ্ট্রের কথা বলেই থেমে যাননি ;বরং এই রাষ্ট্রটি কিভাবে গঠিত হবে, সেই সম্পর্কেও বলেছেন। তিনি বলেন ___'স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন এই রাষ্ট্রটির শুরু হবে কোন মহাদেশের নির্দিষ্ট এমন কোন ভূখণ্ড থেকে, যেখানকার জনগণ ইসলামকে তাদের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়, পৃথিবীতে ইসলামি জীবন বিধানের বাস্তবিক নমুনা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, এ পথে আগত সকল বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, অবরোধ-বয়কট ইত্যাদি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে এবং চরম বিপদের মোকাবিলায় আত্মপ্রত্যয়ী ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এজাতীয় ভূখণ্ডের নমুনা যখনই একাধিক হবে, তখনই সবগুলোকে একীভূত করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব''।

কারজাভির মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের একটি আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে; যা নিজস্ব সংবিধান ও আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সংবিধানের আইনের ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। এটা বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, আন্তর্জাতিক বিষয় সমূহ সব ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হবে।

তিনি আরো মনে করেন, ইসলামী রাষ্ট্র কোন রাজতন্ত্র নয় বরং পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র শুধু কর আদায় অর্থাৎ ট্যাক্স সংগ্রহের রাষ্ট্র নয় বরং একটি হেদায়াত(গাইডেন্স) মূলক রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালীদের স্বার্থ উদ্ধার নয় বরং দুর্বলদের আশ্রয়স্থল হবে।

তিনি অভিযোগ করেন (কতিপয়) মানুষ মনে করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি একটি পশ্চিমা আবিষ্কার । বিশেষত ফরাসি বিপ্লবের পর সামনে এসেছে। অথচ ইসলামই সবার আগে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কারজাভি হাকিমিয়্যাহ কে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supreme

domination) এর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেখানে আইন প্রণয়নের সর্বভৌম সত্তা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ; তার কোন সৃষ্টি নয়। তবে এর মানে এই নয়, মানুষ কোন আইনই প্রণয়ন করতে পারবে না । বরং এর অর্থ হল, মানুষ শরীয়াহর বিধি-বিধানের আলোকে নিজেদের জন্য আইন তৈরি করতে পারবে, তবে শরিয়াহকে পাশ কাটিয়ে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।

মূলত ইসলামী রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধরণের রাষ্ট্র যা কেবল রাজনৈতিক নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূল ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ, এবং শরিয়াহ আইন। এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করব কুরআন, হাদীস, এবং খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদদের মতামতের আলোকে।

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: রাষ্ট্রের ভিত্তি

ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষ নয় বরং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা-ই হলেন সার্বভৌমত্বের মালিক। কুরআনে বলা হয়েছে:

" ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ "

"হুকুম তো কেবল আল্লাহরই।" — (সূরা ইউসুফ: ৪০)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন:

"যে সমাজে আল্লাহর আইন অনুসরণ করা হয় না, বরং মানুষের মনগড়া আইন প্রতিষ্ঠিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে জাহেলিয়াতের শাসনব্যবস্থা।"

মওদূদী বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো 'ইলাহি সার্বভৌমত্ব'। এখানে জনগণ নয়, আইন প্রণেতা কেবল আল্লাহ।" ("তাফহিমুল কুরআন" ও "ইসলামী রাষ্টনীতি")

২.খিলাফত ও নেতৃত্ব কাঠামো:

ইসলামী রাষ্ট্রে নেতা একজন 'খলিফা', যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাম আল-মাওয়ার্দী (Al-Mawardi) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আহকামুস সুলতানিয়্যাহ"-তে বলেন:

"খিলাফত হচ্ছে এমন একটি নেতৃত্ব যা নবুয়তের দায়িত্বসমূহ সমাজে বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত হয়—বিশেষত দ্বীনের সংরক্ষণ ও দুনিয়াবি বিষয়গুলোর সুব্যবস্থা।"

খলিফা জনগণের প্রতিনিধি হলেও তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে আইন প্রণয়ন করতে পারেন না।

৩. শুরা ও জনগণের অংশগ্রহণ:

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক একনায়ক নন; বরং জনগণের পরামর্শ গ্রহণ তার দায়িত্ব।

" ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ"ْ

"তাদের কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।" — (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

ইবনু কাসীর এই আয়াতের তাফসিরে বলেন:

"শূরার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ ইসলামে একটি মৌলিক রাজনৈতিক নীতি।"

৪. আইন ও বিচারব্যবস্থা:

রাষ্ট্রীয় আইন সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত।

" ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ"ُ

“তুমি তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দ্বারা বিচার কর।” — (সূরা মায়িদাহ: ৪৯)

ইমাম শাফেয়ী বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি বিধান অনুসরণ করে, সে কুফরির পথে চলছে।"

৫. সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনীতি:

ইসলামী রাষ্ট্র দারিদ্র্য দূরীকরণ, যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং বায়তুল মাল ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ইবনে খালদুন তাঁর “মুকাদ্দিমা”-তে বলেন:

"আর্থিক ও সামাজিক সুবিচারই একটি রাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রধান উপাদান। ইসলাম এ বিষয়ে অতুলনীয়।"

৬. সংখ্যালঘু অধিকার ও ধর্মীয় সহনশীলতা:

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তারা নিরাপত্তা, ধর্ম পালন এবং সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা পায়।

ইমাম আবু ইউসুফ, হানাফি মাজহাবের অন্যতম ইমাম, “কিতাবুল খরাজ”-এ লেখেন:

"অমুসলিমদের উপর অবিচার করা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হারাম, এমনকি তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে ও থাকে।"

অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রের অবকাঠামো একটি ভারসাম্যপূর্ণ, আল্লাহভীতিপূর্ণ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত কাঠামো। এটি কেবল ধর্মীয় আবেগ নয়, বরং একটি বাস্তব ও কার্যকর রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। আধুনিক সময়ের ইসলামি চিন্তাবিদরা যেমন মওদূদী, হাসান আল বান্না, এবং ইউসুফ আল-কারযাভী—তাঁদের রচনায় এ কাঠামোর বিশ্লেষণ আরও সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

■ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবকাঠামো

গণতন্ত্র (Democracy) আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ও প্রচলিত শাসনব্যবস্থা। এর ভিত্তি হলো জনগণের শাসন – "সরকার জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য" (goverment by the people, for the people)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে বিবেচনা করে, যেখানে নাগরিকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এই শিরোনামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল উপাদানসমূহ, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, আইন প্রণয়নের ধরণ, নৈতিকতা, বিচারব্যবস্থা, এবং এর কার্যকরী দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে।

১.<u>সার্বভৌমত্ব</u>: জনগণের ইচ্ছাই আইন

গণতন্ত্রে জনগণই হলো সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। যে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিদ্যমান, সেখানে শাসনক্ষমতা বা হুকুমের উৎস জনগণের সম্মতি ও মতামত।

Jean-Jacques Rousseau তাঁর "The Social Contract" গ্রন্থে বলেন:

> "The people are the sovereign. The law is the expression of the general will."

অর্থাৎ, জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই আইন এবং শাসনের উৎস।

এই ধারার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যারা সরাসরি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের উৎস হচ্ছে জনগণ। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা জনগণের মধ্য থেকে উৎসারিত হয় এবং জনগণের প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনে বলা হয়েছে:

> "ِالْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" – "হুকুম তো কেবল আল্লাহরই।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

এই আয়াতের আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি জনগণ নিজেদেরকে আইন প্রণেতা হিসেবে স্থাপন করে, তাহলে তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। সুতরাং, এই মতবাদ ইসলামি বিশ্বাসে একেবারে পরিত্যাজ্য।

ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, "যে জাতি আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে জনগণের মতকে প্রধান করে, তারা গোমরাহীর পথে চলেছে।"

২. শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। যারা সংখ্যায় বেশি, তাদের মতকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত করা হয়।

আব্দুল কাদের ওদাহ বলেন: "গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়, অথচ ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সংখ্যার ভিত্তিতে নয়।"

কুরআন বলে:

" ﻭَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ِ" – "যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"

(সূরা আনআম: ১১৬)

৩.আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন তৈরি হয় সংসদ বা পার্লামেন্টে। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি মোটামুটি নিম্নরূপ:

জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

এই প্রতিনিধিরা সংসদে আইন প্রস্তাব করেন ও আলোচনা করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আইন পাস হয়।

প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হয়।

সুতরাং, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন হয় মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সংসদে। এই আইনের ভিত্তি হয় মানবচিন্তা, সময়োপযোগী প্রয়োজন এবং সামাজিক মতামতের উপর। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কোনো কর্তৃত্ব এখানে গৃহীত নয়।

ইমাম আল-আলূসী বলেন: "যে রাষ্ট্রে মানুষের রচিত আইন আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য পায়, তা হচ্ছে তাগূতির শাসন।"

ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন: "যদি গণতন্ত্র এমন হয় যেখানে মানুষের ইচ্ছা শরিয়াহর বিরোধিতা করে আইন প্রণয়ন করে, তবে তা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।"

৪.ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নৈতিক শূন্যতা

গণতন্ত্রের আরেকটি মৌলিক ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)। এই দর্শনের মূল কথা হলো—রাষ্ট্র ও ধর্মের আলাদা অবস্থান। ফলে আইন, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা—সবকিছু পরিচালিত হয় ধর্মবিচ্ছিন্নভাবে।

মওদূদী বলেন: "ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র একটি আত্মঘাতী ধারণা, যেখানে নৈতিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে।"

হাসান আল বান্না বলেন: "যে জাতি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা নৈতিক পতনের দিকে ধাবিত হয়।"

৫.বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় সংবিধান ও মানবাধিকার সনদের ভিত্তিতে। এসব সনদের মূল প্রেরণা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, যেখানে একমাত্র মানবিক অভিজ্ঞতাই আইন ও ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।

শাইখ তাকি উসমানী বলেন: "যে রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা শরিয়াহর বিকল্প রূপে মানব রচিত সংবিধানকে গ্রহণ করে, তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতা হারায়।"

৬. মিডিয়া, শিক্ষা ও জনমত

গণতন্ত্রে মিডিয়াকে বলা হয় "চতুর্থ স্তম্ভ" (Fourth Estate)।গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মিডিয়া, শিক্ষা ও জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এগুলো অনেক সময় রাজনৈতিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক স্বার্থ বা বিদেশি প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার বিভেদ ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

ইমাম গাযালী বলেন: "সত্য গোপন করাই হচ্ছে এক ধরণের বড় ফিতনা।" – ইহইয়া উলুমুদ্দিন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবতাবাদ ও স্বাধীনতার নামে একটি নৈতিকতা-বিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এতে কিছু প্রশাসনিক ও মানবিক সুবিধা বিদ্যমান, তবে ইসলামী রাষ্ট্রধারণার মূল নীতিসমূহের সাথে এর গভীর বিরোধ রয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদরা এই ব্যবস্থাকে এমন এক সমাজ কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেখানে মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে আইনপ্রণেতা হিসেবে স্থাপন করা হয়। ফলে, এই ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়—বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার দাবিতে সত্য ও অযথার পার্থক্য নিরূপণ করার।

■ পাশ্চাত্যের পরিভাষায় আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলত ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। মানবিক যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতানির্ভর বাস্তববোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রধারণা।

মধ্যযুগের খ্রিস্টান গির্জা-নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র এবং দ্য ডিভাইন রাইট অব কিংস-এর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় আধুনিক রাষ্ট্রের এই পরিভাষা। এই নতুন রাষ্ট্র মডেল শাসনের বৈধতা মানুষের ইচ্ছা, মতামত ও সামাজিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করে। ফলে রাষ্ট্র আর 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' বা 'ধর্মীয় আইননির্ভর' কোনো বাস্তবতা নয় বরং একটি মানবসৃষ্ট, পরিবর্তনশীল ও চুক্তিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে পরিণত হয়।

এই কাঠামোর গঠনমূলক ভিত্তি নির্মাণে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজচুক্তি তত্ত্ব(social contract theory)। হোবস, লক ও রুশো – এই তিন চিন্তাবিদের পৃথক পৃথক দর্শন আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নীতিভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। হোবস রাষ্ট্রকে এক ধরনের 'লেভায়াথান' রূপে দেখেন – একমাত্রিক কর্তৃত্ব যেখানে ব্যক্তি তার অধিকারের বিনিময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। লক সমাজচুক্তিকে ব্যাখ্যা করেন ব্যক্তি অধিকার রক্ষার প্রেক্ষাপটে – যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার প্রধান। রুশো রাষ্ট্রকে জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা'র প্রকাশ রূপে দেখেন, যেখানে আইন হয় জন-ইচ্ছার প্রতিফলন।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণাও পাশ্চাত্যের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। এখানে সার্বভৌমত্ব কোন ঐশী উৎস থেকে নয়, বরং মানুষের সম্মিলিত চুক্তি ও রাজনৈতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে গঠিত হয়। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, আইনের দ্বারা চালিত, এবং নৈতিকতার পরিবর্তে আইনের শাসনকেই সর্বোচ্চ হিসেবে মান্য করে।

এই রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসনের মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনপ্রণেতা নির্বাচন করে এবং তারাই আইন তৈরি ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার এই কাঠামোতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি মূল নীতি। নির্বাহী, আইনসভা ও বিচারবিভাগ – এই তিনটি অঙ্গ স্বাধীনভাবে কাজ করে, যা মঁতেস্কিয়ুর 'শক্তির বিভাজন' তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে যুক্ত হয় সংবিধান। এটি নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ করে। পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রে সংবিধান হয়ে ওঠে 'সেক্যুলার বাইবেল', যার আলোকে নাগরিক জীবন পরিচালিত হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় আইন ও মূল্যবোধগুলোর ভিত্তি দাঁড়ায় মানবকেন্দ্রিক চিন্তা, পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা এবং ঐক্যমতের উপর।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্র ও ধর্মের পারস্পরিক বিভাজন এখানকার রাজনৈতিক চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত। প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার ও নীতিনির্ধারণ ধর্মীয় আদর্শ থেকে আলাদা হয়ে একটি নিরপেক্ষ কাঠামোর মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যদিও এই ধর্মনিরপেক্ষতা কিছু ক্ষেত্রে বহুত্ববাদ ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে, তবে অনেক সময় তা ধর্মীয় নৈতিকতার বিসর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এক প্রকার আত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি করে।

এই রাষ্ট্রধারণায় ব্যক্তি হয়ে ওঠে কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তির মতপ্রকাশ, ধর্মপালন, সংগঠন গঠন এবং সম্পত্তির অধিকার – এগুলিকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণি নয় – ব্যক্তি সত্তাই রাষ্ট্রীয় নীতির মাপকাঠি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত থাকে, যদিও বাস্তবতায় এ উদ্দেশ্য প্রায়ই বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে রূপান্তরিত হয়।

তবে এই রাষ্ট্রতত্ত্ব নিছক একটি আইডিয়াল কাঠামো নয়। বাস্তবতায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক দ্বিচারিতা, কর্পোরেট স্বার্থ, মিডিয়া প্রভাব এবং জনমতের ম্যানিপুলেশন দ্বারা প্রভাবিত। গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যক্তি ও সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ করতে পারে; আইনের নামে শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে; এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নৈতিকতা ও আত্মিকতা বিলুপ্ত হতে পারে। ফলে অনেক চিন্তাবিদ, বিশেষ করে ধর্মীয় দার্শনিকগণ, এই রাষ্ট্রতত্ত্বকে এক পবিত্রহীন কাঠামো বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা নয় বরং স্বার্থরক্ষা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রতত্ত্ব, যদিও ইতিহাসের একটি অগ্রসর ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়, তার মূল ভিত্তি হলো – পরিবর্তনশীলতা, আপেক্ষিকতা ও মানবিক অভিপ্রায়। এতে চিরন্তন কোনো নির্দেশনা নেই, নেই আধ্যাত্মিকতা কিংবা ঐশী ন্যায়ের ধারণা। ফলে এই রাষ্ট্রতত্ত্বের বিপরীতে ইসলামি রাষ্ট্রদর্শন একটি পরিপূর্ণ বিকল্প রূপে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনযোগ্য হয়ে ওঠে – যেখানে রাষ্ট্র মানে শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং ন্যায়, হক, দাওয়াহ এবং তাকওয়ার অনুশীলন।

■ আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব পাশ্চাত্য রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্ট যুগের চিন্তাবিদদের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় কর্তৃত্বের অবসান এবং যুক্তিবাদ, মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার উত্থানের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই রাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো, যার মূল ভিত্তি হলো "popular sovereignty" বা জনগণের সার্বভৌমত্ব। উসমানীদের পতনের পর ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বের রাষ্ট্র ধারণায় নানা অ্যাপ্রোচ সামনে আসে। নতুন রাষ্ট্র তৈরীর লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের অনেক স্কলার সেকুলারিজমকে সমর্থন দেন। বিশেষত মিশরীয় বুদ্ধিজীবী আবদে আর রাজীব শক্তভাবে সেকুলারিজম কে সমর্থন করেন। রশিদ রিদা ছিলেন সেই সময়ের একমাত্র বুদ্ধিজীবী, যিনি ইসলামী রাষ্ট্র নামের

নতুন পরিভাষা নিয়ে আসেন গতানুগতিক খিলাফতের বিকল্প রাষ্ট্র ধারণা হিসেবে। রিদাকে আধুনিক সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র ধারনার প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। এনায়েতের মতে_____ ‘তার গবেষণা প্রাথমিক যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য সমূহ থেকে আধুনিক ধারণায় বিবর্তন বিষয়ে গবেষণার হাতে খড়ি হিসেবে সাব্যস্ত হয় :(ইসলামী রাষ্ট্র) বর্তমানে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রকৃতির দিকে (এগোচ্ছে)”।

টমাস হোবস (Thomas Hobbes) তার “Leviathan” গ্রন্থে রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক চুক্তির ফল হিসেবে বর্ণনা করেন, যেখানে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক স্বাধীনতা ত্যাগ করে রাষ্ট্রের হাতে নিরাপত্তার বিনিময়ে ক্ষমতা প্রদান করে। অন্যদিকে, জন লক (John Locke) ব্যক্তি অধিকার এবং ‘limited government’-এর পক্ষে অবস্থান নেন, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার অগ্রাধিকার পায়। জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau) “The Social Contract”-এ বলেন, "Man is born free, and everywhere he is in chains"—তিনি রাষ্ট্রকে জনগণের ‘সাধারণ ইচ্ছা’র (general will) প্রতিফলন মনে করেন।
আধুনিক রাষ্ট্র আইনের শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও, এই আইন মানবসৃষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। এর কাঠামোতে ধর্মকে ব্যক্তিগত আচার হিসেবে রাখা হয়, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো অবস্থান থাকে না। এমন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পরিচয় গড়ে ওঠে নাগরিকত্ব, জাতীয়তা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের উপর, যা একদিকে বহুত্ববাদ সৃষ্টি করলেও, অন্যদিকে নৈতিক শূন্যতাও সৃষ্টি করে।

ড. রজার গ্যারোড (Roger Garaudy), যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তার “L'Islam en Occident” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "The secular state creates a society without a soul... it treats man as merely an economic and political animal." আধুনিক রাষ্ট্র যদিও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল, কিন্তু আত্মিক সংকট ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের এক প্রকট চিত্রও সেখানে বিদ্যমান।

অন্যদিকে, ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক কাঠামো, যার ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Allah)। ইসলামে রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়; বরং তা একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামো, যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দাওয়াহর মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করা।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

"الْوِلَايَةُ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ"

অর্থাৎ, “মানুষের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম।” (As-Siyasah Ash-Shar’iyyah)

ইমাম আল-মাওয়ার্দী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ”-তে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন:

১) শরীয়াহর শাসন,

২) আমানত প্রতিষ্ঠা,

৩) ইনসাফ কায়েম,

৪) দ্বীন রক্ষা ও প্রচার।

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের উৎস হলো: কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। শাসক বা সংসদীয় সংস্থা কোনো সময়ই শরীয়াহবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে না। ইমাম শাতিবি (রহ.) “আল-মাকাসিদ আশ-শারইয়াহ” গ্রন্থে বলেন: ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পাঁচটি মৌলিক অধিকার রক্ষা—দীন, নফস, আকল, নস্ল ও মাল।

সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) উল্লেখ করেন:

"A true Islamic state is not merely a system of government; it is the very implementation of Allah’s sovereignty on Earth." (Fi Zilal al-Qur’an)

আবুল আলা মওদূদী (রহ.) ইসলামী রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন:

"The Islamic state is a Divine institution, which does not derive its authority from the people but from the Creator of all mankind." (Political Theory of Islam)

তাদের মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

√সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

√রাসূল (সা.) প্রদত্ত সুন্নাহ ও কুরআনই সর্বোচ্চ সংবিধান

√ক্ষমতা একটি আমানত, জনগণের খিদমতের মাধ্যম

√ন্যায়বিচার, জাকাত, ইবাদত ও দাওয়াহ এর ভিত্তিমূল

আধুনিক রাষ্ট্রে ‘ভোট’ শাসনের বৈধতার ভিত্তি, অথচ ইসলামে কেবল ‘বাইআত’ বা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা শরীয়াহ মেনে চলার শর্তসাপেক্ষ। শুরা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরামর্শভিত্তিক নেতৃত্ব গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রের সংখ্যাগত আধিপত্য থেকে ভিন্ন।

ড. মুহাম্মদ আসাদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “The Principles of State and Government in Islam”-এ বলেন:
"Islam does not differentiate between moral law and political law; they are one and the same." — অর্থাৎ, ইসলামে নৈতিকতা ও রাষ্ট্রনীতি পৃথক নয়, বরং একই উৎস থেকে প্রবাহিত।
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আধুনিক রাষ্ট্র মানবকেন্দ্রিক, আপেক্ষিক এবং ধর্মহীন মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে। ধর্মীয় নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নয়ন এখানে গৌণ, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোগবাদ এবং রাজনৈতিক সুবিধাই মুখ্য। অপরদিকে, ইসলামী রাষ্ট্র একটি আল্লাহকেন্দ্রিক, ঐশী আইনের শাসনে পরিচালিত কাঠামো, যেখানে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ বিবেচিত হয়।
আধুনিক রাষ্ট্র বাহ্যিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু আত্মিক ও নৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র বাহ্যিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরজগতের সংশোধন ও তাযকিয়াহর চর্চা করে। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র একটি সময়োচিত ও প্রয়োজনীয় বিকল্প মডেল।

■ পাশ্চাত্য জীবনের একটি ছবি

এই যুগে মিশরের কিছু লেখক -সাহিত্যিক পশ্চিমা সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার এবং এই সভ্যতাকে নিজেদের জন্য একটি অন্যতম আদর্শ নমুনা(Ideal) হিসেবে বিবেচনা করার জন্য উন্মুক্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বস্তুত মিশরের ওপর বিভিন্ন কারণে পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব দিনদিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। পাশ্চাত্যের দিকে মিশর ক্রমশি এ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল শ্রেণীটি পশ্চিমা সমাজ ও সভ্যতার অবিকল প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠার উপক্রম ছিল! মিশর এক্ষেত্রে এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে ১৯৩৮ সালে ডঃ হোসেন একে পশ্চিম জীবন ও সভ্যতার মডেল প্রতিপন্ন করেন। তিনি তার বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় ‘মুস্তাকবিলুস সাকাফাহ ফি মিশর’গ্রন্থে লিখেছেন :
আমাদের বস্তুগত জীবন, সমাজের উচ্চশ্রেণী এবং পরিবারগুলির সম্পূর্ণ রূপে (অন্যান্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান এবং উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে) পশ্চিমা জীবনধারা প্রভাবিত। যাদের জীবন যাত্রার মান উচ্চ এবং যাদের কাছে সম্পদ উপকরণ আছে প্রচুর, তারা পশ্চিম জীবন তারা বেশি প্রভাবিত এবং যাদের কাছে এসবের অভাব, তারা (অপারগতাবশত) এর থেকে দূরে। এর মানে হলো একজন মিশরের পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ সেটাই, যা একজন পশ্চিমার বস্তুগত জীবন। আমাদের মানসিক জীবন তার বহিঃপ্রকাশের বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমায়ত। আমাদের সরকার ব্যবস্থা

সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমায়ত। আমরা কোন দ্বিধা বা উৎকণ্ঠা ছাড়াই এটিকে ইউরোপ থেকে অবিকল স্থানান্তরিত করেছি। যদি আমরা এই বিষয়ে নিজেদের কিছু দোষ দিতে চাই, তবে তা শুধুমাত্র এই যে, আমরা ইউরোপের কাছ থেকে এসব ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোগুলো আমদানি করতে কিছুটা ধীরতা এবং অলসতা দেখিয়েছি!

শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করুন, প্রায় এক শতাব্দী ধরে এর ব্যবস্থা কি এবং তা কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত! সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমা ধারার উপর, এরমধ্যে সংশয় ও মতবিরোধের কোন অবকাশ নেই। আমরা আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে আমাদের বাচ্চাদের একটি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়ে তুলেছি ।

এ সকল বিষয়ের উল্লেখ শেষে তিনি এই উপসংহারে আসেন :

এই সমস্ত জিনিস এই বাস্তবতার লক্ষণ যে, আমরা বর্তমানে ইউরোপের সাথে এমন ঘনিষ্ঠতা ও মিতালী রাখতে চাই, যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে, যতক্ষণ না আমরা শব্দ এবং অর্থে,প্রকৃতি এবং আকৃতিতে এর একটা অংশ হয়ে উঠি ।

পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজের গভীর প্রভাব এর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল মিশরীয় নারী মুক্তির বিখ্যাত নকিব কাসেম আমিনের বই 'তাহরীর আল-মারআহ'(নারী স্বাধীনতা) এবং '' আল-মারয়াহ-আল-জাদিদাহ'। প্রথম বইয়ের লেখক দাবি করেন যে বেপর্দা হওয়ার আহবানের মধ্যে ধর্মের কোন বিরোধিতা নেই। তার বক্তব্য হলো ইসলামী শরিয়া কয়েকটি সর্বজনীন নীতি এবং সাধারণ সীমা পরিসীমার নাম। যদি বিধানের শাখা প্রশাখা গত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বয়ান করা এর দায়িত্ব হত তাহলে তার মধ্যে একটি সর্বজনীন আইন হওয়ার এমন সমর্থ্য থাকত না , যা প্রত্যেক যুগ ও প্রতিটি জাতির উপযোগী। শরীয়তের সেই হুকুম আহকাম যা প্রচলিত অভ্যাস ও বিষয়দের উপর ভিত্তিশীল, সাথে পরিস্থিতি ও সময় সাপেক্ষে রদবদল করা হয়। শরীয়তের দাবি শুধু এটাই যে, এই পরিবর্তন এমন কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়, যার দ্বারা এর সাধারণ ভিত্তি গুলির কোনটি প্রভাবিত বা আক্রান্ত হয়।

বইটিতে লেখক চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :এক,পর্দা। দুই. জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণ। তিন.বহুবিবাহ । এবং,চার.বিবাহ বিচ্ছেদ। এই চারটি বাহাসে তিনি পশ্চিমাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং দাবী করেন এটাই ইসলামের মতাদর্শ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং এর মূল্যবোধের প্রতি লেখক এর গভীর মুগ্ধতা তার দ্বিতীয় বই ''আল-মারআহ-আল-জাদিদাহ' তে আরো স্পষ্ট । বইটিতে লেখক যুক্তির অনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা দ্বারা সমর্থিত নয়, যা সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে, হোক সেই প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও বিশ্বাস দিনের

পথে আগত কিংবা অন্য কোনভাবে। এই পদ্ধতিকেই পশ্চিমারা একমাত্র বৈজ্ঞানিক(Scientific) পদ্ধতি বলে।

আধুনিকতাবাদীরা (Modernist)কখনো কখনো আধুনিকায়ন ও প্রগতির প্রক্রিয়ায় এমন সব দর্শন ও ব্যবস্থার মদদ খুঁজতে থাকে, যা বহু আগে স্বয়ং পশ্চিমা সমাজেই সীয় গুরুত্ব ও মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এবং এখন তা প্রতিক্রিয়া বাদ এবং পশ্চাদপসরণ ও রক্ষণশীলতার প্রতীক এবং পুরনো অভিজ্ঞতার উচ্ছিষ্ট হিসেবে রয়ে গেছে, যা পশ্চিমের নেতারা তাদের সম্মিলিত পরীক্ষা হিসেবে সীমিত সময়ের জন্য একদা গ্রহণ করেছিল ;কিন্তু সেসবের অতিশয় ক্ষতিকরতা এবং অসুবিধা গুলি স্পষ্ট হওয়ার পর ছুড়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে এবং এর চেয়ে উন্নত প্রশস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল জাতীয়তাবাদ (Nationalism),যা ইউরোপে পরিত্যক্ত হয়েছে ;কিন্তু ইসলামী প্রাচ্যের কিছু নেতা এখনো এটিকে বক্ষে নিয়ে নিতে মরিয়া এবং এটিকে মনে করে মানবীয় চিন্তার অগ্রগতি ও বিকাশের চরম রূপ। অথচ এটি ছিল সীমিত উপজাতীয় জীবন এবং বেদুইন চিন্তা ধারার একটি বিস্তৃত ও উন্নত রূপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন একটি পুরনো পোশাক, যাকে খোদ পশ্চিমের লোকেরা ছুড়ে ফেলেছে। এখন তাদের মতে, এটি একটি ধ্বংসাত্মক এবং বিপর্যয়কর উপাদান ও শক্তি। যা মানব সমাজের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং মানবজাতির স্বভাব প্রকৃতি বিগড়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দূরদর্শী ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী মানুষেরা বর্তমানে জাতীয়তাবাদ কে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং তারা এটিকে প্রাচীনকালের একটি সেকেলের ফ্যাশন এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতার নিদর্শন বলে মনে করেন। এটিকে মানবতা ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যারা মানবীয় ঐক্য এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা,দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তেমনি দুই মহান ছিন্তাবিদের অভিমত হাজির করা হচ্ছে। একজন হলেন বিখ্যাত পশ্চিমা দার্শনিক আর্নল্ড টয়নবি,অন্যজন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণ।

টয়নবি তার এক রচনায় লিখেছেন :মানবতার ভবিষ্যতে এই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভরশীল,যা শুধুমাত্র ধর্মই তৈরি করতে পারে। মানবজাতির আজ এটাই প্রয়োজন। কমিউনিজম মানবজাতিকে একত্র করার দাবি করে। আফ্রিকায় ইসলাম মানবজাতির একত্রকারী একটি শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করছে।তবে জাতীয়তাবাদ মানবজাতিকে একত্র করে না ;বরং বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করে, তাই এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এটি মানব জাতিকে ধ্বংস করা এবং নিজেকে তার ধ্বংসাবশেষে দাফন করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। পারমাণবিক যুগে আমাদের দুটি চরম অবস্থার মধ্য থেকে একটি বেছে

নিতে হবে। যদি আমরা নিজেদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতেন না চাই তবে বৈষম্য ছাড়াই আমাদের সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করে একটি ঐক্যবদ্ধ মানব পরিবার হিসেবে বাঁচতে শিখতে হবে ।

ডক্টর রাধা কৃষ্ণ ১৯৬৩ সালের ১০ জুন জাতিসংঘে তার বক্তৃতাকালে পৃথিবীর জাতিসমূহ কে ‘পৃথিবীতে একটি পরিবার ‘ধারণা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। যাতে পৃথিবী সামরিক জাতীয়তাবাদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। তিনি বলেন :মানুষের বিপদজনক পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করতে না পারা একটি বড় ভুল চিন্তার নির্দেশ করে । ইতিহাস দেখায় যে, রাজনৈতিক আধিপত্য, জাতিগত বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণ মানুষকে যুদ্ধের আগুনে নিমজ্জিত করেছে।এবং আজ যদি এই রাজনৈতিক আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক শোষণকে সব দিকে সমৃদ্ধি এনে এবং জাতীগত বৈষম্য দূর করে এর অবসান ঘটানো যায় তাহলে তা হবে বিশ্ব শান্তির জন্য একটি মহৎ সেবা ।

■ ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত

মানব ইতিহাসে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চিরকালীন। ঈমান মানুষের অন্তরের সেই শক্তি যা তাকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন, এবং আখিরাতমুখী ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাশীল রাখে। অপরদিকে বস্তুবাদ মানুষকে শুধুমাত্র জাগতিকতা, ভোগ, প্রযুক্তি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতার মাঝে আবদ্ধ করে। এই দুই চিন্তাধারার পারস্পরিক অবস্থান চরমভাবে সাংঘর্ষিক। কারণ ঈমান মানুষকে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে ধাবিত করে, আর বস্তুবাদ মানুষকে ইন্দ্রিয়তাড়িত, সময়সীমাবদ্ধ এবং উদ্দেশ্যহীন করে তোলে।

ঈমান কেবল একটি বিশ্বাস নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ন্যায়পরায়ণতা, মানবসেবা এবং আখিরাতের চিন্তায় প্রেরণা জোগায়। ঈমান ছাড়া মানুষের কর্মে উদ্দেশ্য থাকে না, এবং নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বস্তুবাদ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, মানুষের দেহ ও জৈবিক প্রবৃত্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। বস্তুবাদ মতে, যা দেখা যায়, পরিমাপ করা যায় এবং লাভজনক তা-ই সত্য, বাকিগুলো অপ্রয়োজনীয় কল্পনা।

আধুনিক সমাজ বস্তুবাদকে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব নয় বরং বাস্তব জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা ঈশ্বর, আখিরাত ও নৈতিকতার প্রশ্নে নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে সেকুলারিজম ও মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতে ঈমান-ভিত্তিক

মূল্যবোধের স্থান নিয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও স্বাভাবিকীকৃত নৈতিক অবক্ষয়। বিজ্ঞাপন, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো মানুষকে ক্রমাগত বলছে—"তোমার যত বেশি থাকবে, তুমি তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

এই বস্তুবাদী ঢেউ মুসলিম সমাজকেও স্পর্শ করেছে। মুসলিম পরিবারগুলোতে এখন সন্তানদের ঈমান শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে তাদের সফলতা, অর্থ ও চাকরি নিয়ে বেশি চিন্তা করা হয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস—আখিরাত, তাকওয়া, জবাবদিহিতা—ধীরে ধীরে চেতনা থেকে মুছে যেতে বসেছে। অথচ কুরআন স্পষ্টভাবে বলে, "তারা দুনিয়ার বাহ্যিক দিকটাই জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফেল।" (সূরা রূম: ৭)

এই চিন্তার ফলস্বরূপ সমাজে নৈতিক সংকট বাড়ছে। বস্তুবাদ আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ ও হতাশা তৈরি করে, যার পরিণতিতে আত্মহত্যা, মানসিক রোগ ও পারিবারিক ভাঙনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈমানহীন জীবন মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, বরং আরো অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্ত হয়।" (সূরা রা'দ: ২৮)

ইসলামি চিন্তাবিদেরা এই সংঘাতকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইমাম গাজ্জালী বলেন, যে জ্ঞান আখিরাতের চিন্তা জাগায় না, তা অন্ধকার। ইকবাল বলেন, পাশ্চাত্য শক্তি পেলেও আত্মাকে হারিয়েছে। মাওলানা মওদূদী বস্তুবাদকে একটি মানসিক আগ্রাসন বলে আখ্যা দিয়েছেন যা মুসলিমদের ঈমানকে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

তবে এই সংকটে মুসলমানদের জন্য পরিত্রাণের পথ রয়েছে—সত্যিকারের ঈমান জাগ্রত করা, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, আখিরাতমুখী চিন্তার প্রচার, এবং দাওয়াহকে নতুনভাবে শক্তিশালী করা। কুরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে জীবন গঠনই পারে বস্তুবাদের ধ্বংসাত্মক রূপকে মোকাবিলা করতে। মুসলিমদের উচিত নিজেদের চিন্তাপ্রণালী, জীবনধারা ও সমাজব্যবস্থাকে ঈমানভিত্তিক রূপে গড়ে তোলা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব হলো, তাদেরকে এমন চিন্তার ভিত গড়ে দেওয়া যাতে তারা বস্তুবাদী মোহ থেকে বাঁচতে পারে এবং ঈমানের আলোয় নিজের জীবন ও সমাজ আলোকিত করতে পারে। ঈমান হলো এক আলোকবর্তিকা, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে, আখিরাতের দিকে, ন্যায়ের দিকে এবং চূড়ান্ত মুক্তির পথে নিয়ে যায়। আর বস্তুবাদ হলো

অন্ধকার এক গুহা, যেখানে মানুষ কেবল দেহের ক্ষুধা মেটাতে ব্যস্ত থাকে এবং আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলে।

এই দ্বন্দ্বের শেষ হবে না, তবে পথ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব মানুষের। কেউ বস্তুবাদী বিলাসের দাস হয়ে দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়, আর কেউ ঈমানের হাত ধরে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা করে। মুসলমানদের কর্তব্য—এই দ্বিতীয় পথটিকে গ্রহণ করা, এবং অপরকে সে পথে আহ্বান করা।

■ ধর্ম নিরপেক্ষ বনাম ধর্ম নির্ভরতা

মানবজাতি তার আদিম ইতিহাস থেকেই ধর্মকে জীবনের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্ম মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণ করে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ধর্মীয় অপব্যবহার ও চার্চের কর্তৃত্ববাদ থেকে মুক্তি পেতে তারা যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে, তা পরিণত হয়েছে এক নতুন মতবাদে, যেখানে ধর্মের অবস্থান ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবন থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা নয়, বরং এক প্রকার অবিশ্বাস, এমনকি শত্রুতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম মূলত ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি প্রতিক্রিয়াশীল ফল। মধ্যযুগে চার্চ যখন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তখন রেনেসাঁ, রিফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্টের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম থেকে স্বাধীনতা দাবি করে। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে মানবজীবনের সকল ব্যবস্থা ধর্ম ছাড়াই পরিচালিত হবে। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ, আইন হবে ধর্মবিচ্ছিন্ন, এবং শিক্ষা হবে ধর্মহীন। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি সভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়, কারণ ইসলাম ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের বিষয় নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি দিক পরিচালনায় আল্লাহর নির্দেশনা চায়। ইসলাম বলে, আল্লাহই একমাত্র হাকিম বা শাসক, এবং তাঁর বিধান অনুসারে শাসন না করাকে কুফর, জুলুম ও ফাসিক হিসেবে বিবেচনা করে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার দ্বারা বিচার করে না, তারা কাফের।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)।

ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দাবি হলো, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় এবং রাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন ও অর্থনীতি হতে তা পৃথক রাখতে হবে। অথচ বাস্তবতা হলো, কোনো রাষ্ট্র আদর্শ বা বিশ্বাসহীনভাবে চলতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নীতিগত ভিত্তি থাকে, যা সেই রাষ্ট্রের আইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। সেকুলারিজমও একটি বিশ্বাস—যা ধর্মহীনতার বিশ্বাস। এ কারণে এটি "নেতিবাচক ধর্ম" বা "নবধর্ম" হিসেবে অভিহিত হয়। ফরাসি দার্শনিক আগাস্ত কোন্ত (Auguste Comte) বলেছিলেন, "মানুষই এখন মানুষের উপাস্য।"

ইসলামি চিন্তাবিদরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামবিরোধী এক ধ্বংসাত্মক মতবাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মওলানা মওদূদী বলেন, "সেকুলারিজম মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে মানবকেন্দ্রিক, ভোগবাদী, স্বার্থান্বেষী সমাজ তৈরি করে।" সাইয়্যেদ কুতুব বলেন, "যে সমাজে আল্লাহর বিধান নেই, তা জাহিলিয়াত, যদিও তা আধুনিক লেবেল পরে আসে।" ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "যে শাসন আল্লাহর শরিয়াহ অনুযায়ী চলে না, তা ফিতনার কারণ।"

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আইন তৈরি হয় মানুষের ইচ্ছা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, যেখানে ইসলামে আইন নির্ভর করে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর। এই পার্থক্যই রাষ্ট্রচর্চায় ধর্মনির্ভরতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘাতকে চূড়ান্ত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে সুদ হারাম এবং এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই ধ্বংসের কারণ। অথচ সেকুলার রাষ্ট্রে সুদ হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। ইসলামে সমলিঙ্গ বিবাহ, অবাধ যৌনতা ও নগ্নতা হারাম, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এসবকে "ব্যক্তিস্বাধীনতা" হিসেবে গ্রহণ করে।

ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিষাক্ত ছায়া মুসলিম বিশ্বের ওপরও পড়েছে। উপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় তাদের শিক্ষা, বিচার ও প্রশাসনে ধর্মকে অপসারণ করেছে। ফলে মুসলিমরা নিজেদের 'ধর্মপ্রাণ' মনে করলেও তাদের রাষ্ট্র, আইন ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের কোনো জায়গা নেই। একদিকে মসজিদে নামাজ পড়া হয়, অন্যদিকে আদালতে শরিয়াহ নয়, পাশ্চাত্য আইন চলে।

ধর্মনির্ভর সমাজ মানুষকে আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ শেখায়। মানুষ বোঝে, সে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে, তাই সে অন্যায় করতে ভয় পায়। ধর্মনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে কেবল চাকরির জন্য নয়, বরং চরিত্রবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।

ধর্মনির্ভর পরিবারে সন্তানের মাঝে তাকওয়া, ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সেবাবোধ তৈরি হয়। ধর্মনির্ভর রাষ্ট্রে নেতারা জনগণের খেদমতগার হিসেবে দায়িত্ব পালনে সচেতন হন।

অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে মানুষ কেবল ভোগ-বিলাস, প্রযুক্তি ও আধিপত্যের পেছনে ছুটে। তারা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু চিন্তা করে না। ধর্মহীন সমাজে বিয়ের পবিত্রতা নেই, পরিবার ভেঙে পড়ে, আত্মহত্যা ও মানসিক রোগ বেড়ে যায়। এ সমাজে মানুষ কর্মক্ষম কিন্তু আত্মিকভাবে শূন্য। সেকুলারিজম মানুষকে এতটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে যে, তারা জীবনকে শুধুই "এখানে ও এখন" ভেবে দেখে। আখিরাত ও জবাবদিহিতার চেতনা না থাকায় তারা অন্যায় করতেও দ্বিধা করে না।

ইসলাম ধর্মনির্ভরতার একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ তৈরি করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাষ্ট্র মদিনা ছিল ঈমান, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। খিলাফতে রাশেদা ছিল সত্যিকার অর্থে ধর্মনির্ভর শাসনব্যবস্থা। খলিফাগণ নিজেদের সেবক হিসেবে দেখতেন। তারা রাতের আঁধারে মানুষের খোঁজ নিতে বের হতেন। ধর্ম সেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি ছিল, এবং এর মাধ্যমেই ইনসাফ, নিরাপত্তা ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে মানুষ নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক অনৈতিকতা, দুর্নীতি ও পারিবারিক ভাঙনের কারণে হতাশাগ্রস্ত। এই সমস্যার মূলে রয়েছে ধর্মকে জীবনের মূলধারা থেকে বাদ দেওয়া। তাই এখন সময় এসেছে ধর্মকে আবার সমাজের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার। শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিচার—সবখানে ধর্মীয় নির্দেশনার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া কোনো সমাজ স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে না।

ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না, বরং সেই স্বাধীনতাকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্থাপন করে। ইসলাম বলে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন।" (সূরা নূর: ৫৫) এই খেলাফতই হলো ধর্মনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ, যা মানুষকে জুলুম, অন্যায়, দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর বিধানের আলোয় পরিচালিত করে।

সেকুলারিজম দাবি করে, সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা রাখা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ইসলামকে নিঃসরণ করে অন্য ধর্ম ও মতবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইসলামি প্রতীক,

পোশাক, বিধান—এসবকে নিষিদ্ধ করে "ধর্মনিরপেক্ষতা"র নামে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। ইউরোপ, ভারত, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও এই বৈষম্য স্পষ্ট।

অতএব, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো নিরপেক্ষ মতবাদ নয় বরং ধর্মবিমুখতা। এটি মানুষের আত্মাকে খালি করে দেয় এবং সমাজকে বিভ্রান্ত ও অপূর্ণ করে রাখে। অন্যদিকে ধর্মনির্ভরতা মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতার চেতনায় আলোকিত করে। আল্লাহর নির্দেশনায় পরিচালিত সমাজেই শান্তি, সুবিচার ও সাম্য সম্ভব।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধর্মবিচ্ছিন্ন করা মানে আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করা, যা কুফর ও ধ্বংস ডেকে আনে। তাই মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হলো—নিজেদের চিন্তাচেতনা, পরিবার, শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে ধর্মনির্ভর রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করা।

■ আইন ও বিধানের পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হলো আইন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত বিধান কাদের হাতে থাকে—এই প্রশ্নে। ইসলাম ও গণতন্ত্র উভয়েই আইন-কানুনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও, তাদের উৎস ও কর্তৃত্বে রয়েছে মৌলিক বিভেদ। ইসলামে আইন বা বিধান প্রণয়নকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কুরআনে বহুবার ঘোষণা করা হয়েছে—"হুকুম কেবল আল্লাহরই।" যেমন, আল্লাহ বলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।"

(সূরা ইউসুফ: ৪০)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দ্বারা বিচার করে না, তারা কাফির।"

(সূরা মায়েদা: ৪৪)

অর্থাৎ ইসলামে, মানুষের বানানো আইন নয়, বরং আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়াহই চূড়ান্ত বিধান। রাসূল (সা.)-এর দায়িত্বও ছিল কেবল এই বিধানের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"তুমি তাদের মাঝে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা দিয়েই বিচার কর।"

(সূরা মায়েদা: ৪৯)

অপরদিকে, গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নকারী হচ্ছে মানুষ—সংসদ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত। জনগণের ইচ্ছা বা ভোটই সেখানে চূড়ান্ত হুকুমের উৎস। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, যা জনগণ চাইবে, সেটাই হবে ন্যায়। এখানেই ইসলাম ও গণতন্ত্রের মূল দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

গণতন্ত্র বলে:

"Sovereignty belongs to the people."

অর্থাৎ "সার্বভৌমত্ব জনগণের।"

অপরদিকে ইসলাম বলে:

"Sovereignty belongs to Allah."

অর্থাৎ "সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর।"

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

"যখন মানুষ নিজের মতেই আইন বানায়—আল্লাহর হুকুম ছাড়া—তা জুলুম, কুফর ও ফিসক।"

(إعلام الموقعين, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৮)

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী বলেন:

"ইসলামে 'Legislation' বা বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর। পার্লামেন্ট শুধু মানুষের সমস্যা অনুযায়ী শরিয়াহর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারে, নতুন বিধান তৈরি করতে পারে না।"

("ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা", মওদূদী)

সাইয়্যেদ কুতুব বলেন:

"যে সমাজে আইন বানায় মানুষ, সেখানে আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়—এটা জাহিলিয়াত।"

(ফি যিলালিল কুরআন)

মানুষের তৈরি করা গণতন্ত্রে মানুষেরই মনগড়া আইন সমাজে বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে ওঠে, যদিও তা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। যেমন, সমলিঙ্গ বিয়ে, সুদ, পর্নোগ্রাফি, প্রকাশ্য নগ্নতা—এসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনগতভাবে বৈধ, অথচ ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এখানে এক প্রশ্ন আসে: ইসলাম কি আইন প্রণয়নকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে?

উত্তর হলো—না, ইসলাম কৌশলগত আইন বা তানজিমি আইন প্রণয়নকে অনুমোদন করে, কিন্তু সেটা মূল শরিয়াহর গণ্ডির মধ্যে। যেমন, ট্রাফিক আইন, প্রশাসনিক আইন, শিক্ষানীতি ইত্যাদি শরিয়াহ বিরোধী না হলে অনুমোদনযোগ্য। তবে হালাল-হারাম নির্ধারণের বিধান একমাত্র আল্লাহর।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

"তারা কি এমন শরিক স্থির করেছে, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শরিয়তের বিধান দেয়?" (সূরা শূরা: ২১)

সুতরাং, ইসলামের আইন ও গণতন্ত্রের আইনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে:

ইসলামে বিধান আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে; মানুষ কেবল তা অনুসরণ করে।

গণতন্ত্রে বিধান তৈরি করে মানুষ, যা বদলানো বা বাতিল করাও মানুষের হাতে।

এই পার্থক্যই ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে একটি মৌলিক আদর্শিক সংঘাত সৃষ্টি করে। ইসলাম একটি ঐশী বিধানভিত্তিক ব্যবস্থা; গণতন্ত্র একটি মানবনির্মিত মতবাদ। ইসলাম আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসনের নির্দেশ দেয়, গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছার শাসন কায়েম করে।

পঞ্চম অধ্যায় - ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান

■ খিলাফত সরকারের কাঠামো

খিলাফত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শাসনব্যবস্থা, যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কুরআন-সুন্নাহর বিধান, ইনসাফ ও পরামর্শ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর যে শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল, সেটিই ছিল খিলাফতের প্রকৃত রূপ। এই কাঠামো শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক মডেল নয়; বরং এটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও আইনি ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত এক বিস্তৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা। খিলাফত এর সুনির্দিষ্ট কিছু ধাপ/অংশ বিদ্যমান। যেগুলো ব্যতীত খিলাফাহ কায়েম করা সম্ভব নয় ।

১. খলীফা ও নেতৃত্ব কাঠামো:

খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দু হল খলীফা বা আমীরুল মু'মিনীন। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন, বিচার ও নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর নির্বাচন হয় জনগণের শূরার মাধ্যমে, যা গণসম্মতির এক ধরনের প্রকাশ।

খলীফার যোগ্যতা:

√মুসলিম ও পুরুষ হতে হবে

√ন্যায়পরায়ণ ও তাকওয়াবান হওয়া

√শরীয়ত, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

√শরীয়াহর অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া

খলীফার দায়িত্ব:

√শরীয়াহর বাস্তবায়ন

√ইনসাফ নিশ্চিতকরণ

√উম্মাহর নিরাপত্তা ও কল্যাণ রক্ষা

√দ্বীনের প্রচার ও হেফাজত

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন , "যারা আমার পর খিলাফত পরিচালনা করবে, তারা আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করবে।" (তিরমিযী)

২. শূরা পরিষদ (পরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠান):

শূরা বা পরামর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক উপাদান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)। খিলাফতের শূরা পরিষদে আলেম, অভিজ্ঞ, মুত্তাকী ও সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা থাকেন।

কাজ:

√রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে মতামত প্রদান
√খলীফাকে উপদেশ ও তদারকি
√জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৩. বিচার বিভাগ (কাজী ও শরঈ আদালত):
খিলাফত কাঠামোর বিচারব্যবস্থা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এখানে কাজীগণ শরীয়াহ ভিত্তিক আইন প্রয়োগ করেন এবং তাঁদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব থাকে না।
বৈশিষ্ট্য:
√কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রায়
√মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্য সমান ইনসাফ
√বিচার বিভাগ খলীফার থেকেও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে সক্ষম

উদাহরণ:
খলীফা আলী (রা.) একটি মামলায় এক ইহুদির সঙ্গে আদালতে হাজির হন এবং আদালত ইহুদির পক্ষে রায় দেন। এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।
৪. অর্থনৈতিক কাঠামো (বায়তুল মাল):
খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগকে বলা হয় ‘বায়তুল মাল’। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব, সম্পদ বিতরণ এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।
অর্থের উৎস:
√যাকাত, খেরাত, খরাজ, জিযিয়া
√খনিজ সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ
√পাবলিক সম্পদ ও উম্মাহর সম্পদ
ব্যয় খাত:
√দরিদ্র জনগণের কল্যাণ
√যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও বাহিনী
√শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা
√রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন
৫. জনগণের ভূমিকা:
খিলাফত কাঠামোতে জনগণ কেবল প্রজা নয়, বরং দ্বীন রক্ষায় শরীক। তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে:
√ন্যায়পরায়ণ খলীফার আনুগত্য
√অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ (আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার)

√শরীয়াহর অনুসরণ ও সামাজিক দায়িত্ব পালন
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
“তোমরা এমন এক দল হও যারা ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অন্যায়ে নিষেধ করবে...”
(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)
খিলাফতের লক্ষ্য শুধু শাসন নয়, বরং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবতার হেদায়েত ও মুক্তি নিশ্চিত করা।
খিলাফত কাঠামো একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা ন্যায়, তাকওয়া, ইনসাফ ও শূরার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য নয়, বরং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তুলনায় এটি অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ, দ্বীনভিত্তিক ও মানবিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখনই খিলাফত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন উম্মাহ সম্মানিত ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করেছে।আর যখনই এর বিপরীত টি হয়েছে জাতি অসম্মানিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়েছে ।

■ ইসলামী রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকারের কাঠামো

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় "স্থানীয় সরকার" বলতে এমন একটি শাখা বোঝায়, যা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা ও শরীয়তের আলোকে জনগণের নিকটস্থ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এটি জনগণের ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, শিক্ষা, যাকাত সংগ্রহ, সড়ক নির্মাণ, পানি ব্যবস্থাপনা, এবং সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে। রসূল (সা:) এর সময়ে থেকেই এই কাঠামো বিকশিত হতে থাকে, যা পরবর্তী খিলাফত যুগে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।
১. রসূল (সা:) এর যুগে স্থানীয় শাসনের কাঠামো:
১.১মদিনা সনদের মাধ্যমে ভিত্তি স্থাপন>
মদিনা সনদ (Constitution of Madinah) ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান, যেখানে মুসলিম, ইহুদি, মুশরিকসহ সকল সম্প্রদায়ের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। এতে প্রতিটি গোত্র বা উপজাতিকে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেওয়া হয়।
৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর রসূল (সা:) যে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন, তা ছিল একটি প্রাক-আধুনিক বহু-জাতিগত, বহু-ধর্মীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশাসনিক কাঠামো। এতে ৪৭টি অনুচ্ছেদে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজ নিজ এলাকা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বশাসন এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতার নীতিতে একত্র করা হয়।
> দৃষ্টান্ত:

ইহুদি গোত্রগুলো (বানু কায়নুকা, বানু নাজীর, বানু কুরায়জা) নিজের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থার অধিকার পেত, যদিও তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ হিসেবে থাকত।

১.২ প্রশাসনিক বিভাজন ও প্রতিনিধি নিয়োগ

রসূল (সা:) বিভিন্ন অঞ্চল বা গোত্রের জন্য আমিল (প্রশাসনিক প্রতিনিধি), কালি (বিচারক), এবং মুআল্লিম (শিক্ষাদানকারী) নিযুক্ত করতেন।

যেমন:ইয়ামান, বাহরাইন, নাজরান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেরণ করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ;

মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) – ইয়ামানে বিচারক ও দাঈ হিসেবে

আলা ইবনে হাদরামী (রা.) – বাহরাইনে

আমর ইবনে হাযম (রা.) – নাজরানে

এরা নিজ নিজ এলাকায় জনসম্পর্ক, বিচারকার্য, যাকাত সংগ্রহ, শরীয়ত শিক্ষা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন।

১৩. উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন

রাস্তা নির্মাণ, পানি বিতরণ, যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো।

২. খিলাফতে রাশেদার যুগে স্থানীয় সরকারের কাঠামো:

২.১. অঞ্চল ভিত্তিক প্রাদেশিক শাসন

খোলাফায়ে রাশেদা যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) রাষ্ট্র অনেক প্রসারিত হওয়ায় প্রদেশ ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন ওয়ালী (গভর্নর), কাজী (বিচারক), আমিল (রাজস্ব আদায়ক), ও শুরা প্রতিনিধি থাকত।

২.২. উমর (রা.) এর সময় কাঠামোর সুসংগঠিত রূপ>

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) স্থানীয় প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন।

তিনি ৮টি বড় প্রদেশ গঠন করেন: মক্কা, মদিনা, ইরাক, শাম, মিসর, বাহরাইন, ইয়ামান এবং আজারবাইজান।

প্রতিটি প্রদেশে:

√ওয়ালী (প্রাদেশিক গভর্নর)

√কাজী (বিচারপতি)

√আমিল (রাজস্ব আদায়ক)

√শুরা প্রতিনিধি ও নিরাপত্তা বাহিনী

এভাবে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রশাসনিক ও বিচারিক দায়িত্ব পৃথক রাখা হয়, যাতে কোনো একচেটিয়া ক্ষমতা না হয়।

২.৩. জনগণের মতামতের গুরুত্ব>

স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হতো।

খলিফা নিজে নিয়মিত প্রতিবেদন গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজন হলে তদন্ত পাঠাতেন।

২.৪. নিয়োগ ও জবাবদিহিতা পদ্ধতি

প্রতিনিধিদের সততা যাচাইয়ের জন্য 'তাজকিয়া' নেওয়া হতো।

> দৃষ্টান্ত: উমর (রা.) ওয়ালীদের নিয়োগ দিয়ে ২ বছর পর আর্থিক প্রতিবেদন ও জনমত যাচাই করতেন।

২.৫. শূরা ও জনসম্পৃক্ততা

নাগরিকদের মতামত ভিত্তিক শাসনের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

> দৃষ্টান্ত: কুফা নগরীর গভর্নর নিয়ে জনগণের অভিযোগে উমর (রা.) সরেজমিন তদন্ত পাঠান।

৩. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে কাঠামোর সম্প্রসারণ:

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে স্থানীয় গভর্নরদের প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা আরও বাড়ে। তারা নিজ নিজ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি ও সামাজিক কাজ পরিচালনায় অনেক স্বাধীনতা পেতেন, তবে কেন্দ্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন।

৩.১. গভর্নরের প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রতিটি প্রদেশে গভর্নরের অধীনে বিচার, রাজস্ব, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, বাজার তত্ত্বাবধান, ওয়াকফ ইত্যাদি বিভাগ গড়ে তোলা হয়।

> দৃষ্টান্ত: খলিফা হারুনুর রশীদ ও মুসা ইবনে নুসাইর (স্পেনে) – স্থানীয় সরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারক।

৩.২. মুহতাসিব ও বিচারব্যবস্থা

বাজার নিয়ন্ত্রক (মুহতাসিব), স্থানীয় বিচারক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নিয়োগ দিয়ে স্থানীয় সমাজ উন্নয়নে কাজ করা হতো।

> দৃষ্টান্ত: মুহতাসিবরা বাজারে ওজনে কম, খাদ্যে ভেজাল ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতেন।

৪. স্থানীয় সরকার কাঠামোর বৈশিষ্ট্য:

√শরিয়াভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

√জনগণের সাথে সরাসরি সংযোগ রাখা।
√ কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুসরণ ও জবাবদিহিতা।
√ শুরা পদ্ধতির মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।
√ আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

রসূল (সা:) থেকে শুরু করে খিলাফতে রাশেদা ও পরবর্তী যুগে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের এক শক্তিশালী ও কার্যকর অংশ। এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং একটি আমানত, যা জনগণের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

■ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরজ

> পবিত্র কুরআন থেকে দলিল প্রমাণ:

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি খিলাফতি শাসনব্যবস্থা কায়েম করা মুসলিম উম্মাহর উপর একটি ফরজ (আবশ্যকীয়) দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে শরীয়াহ মোতাবেক বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৯:
"হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বপ্রাপ্তদের।"
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'উলুল আমর' অর্থাৎ নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ইসলামী খিলাফত ব্যতীত শরীয়াহভিত্তিক উলুল আমরের বাস্তবায়ন অসম্ভব।

২. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭:
"...যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফির...যালিম...ফাসিক।"
এই তিনটি আয়াতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আবশ্যকতা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। খিলাফত ছাড়া শরীয়াহ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং খিলাফত ফরজ।

৩. সূরা নূর, আয়াত ৫৫:
"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন..."
এই আয়াতে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে এসেছে, যা খিলাফতের গুরুত্ব ও ফরজিয়ত নির্দেশ করে।

৪. সূরা বাকারা, আয়াত ৩০:

"আমি অবশ্যই পৃথিবীতে একজন খলিফা সৃষ্টি করব।"
এই আয়াতে আদম (আ:) এর মাধ্যমে খেলাফতের সূচনা বোঝানো হয়েছে, যা মানবজাতির ধর্মীয় ও দুনিয়াবি নেতৃত্বের দায়িত্বকে নির্দেশ করে।

> সুন্নাহভিত্তিক দলিল প্রমাণ

১. হাদীস: 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার গলদেশে কোনো বায়আত (খলিফার প্রতি আনুগত্য) নেই, সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।'(মুসলিম: ১৮৫১)
এই হাদীস খিলাফতের অস্তিত্ব এবং বায়আতের বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করে। খিলাফত ছাড়া বায়আতের বাস্তবায়ন অসম্ভব।
২. হাদীস: 'তিনজন ব্যক্তি যদি সফরে থাকে, তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত করুক।'(আবু দাউদ: ২৬০৮)
ছোট একটি জামাআতের জন্য আমীর নিযুক্তির নির্দেশ থাকলে, সমগ্র উম্মাহর জন্য খলিফা নিযুক্তি কত বড় ফরজ তা অনুমেয়।
৩. নবী (সা.) এর খিলাফত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী:
"...তারপর খিলাফত কায়েম হবে নবুওতের পদ্ধতিতে। তারপর তা আল্লাহর ইচ্ছায় উঠিয়ে নেওয়া হবে।"(মুসনাদে আহমদ: ১৮৪3 O)
এই হাদীসে নবুওতির আদলে খেলাফতের গুরুত্ব ও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

> সাহাবীদের ইজমা বা ঐক্যমত্য

১. আবু বকর (রা.) এর খেলাফতের সময় সাহাবীদের ঐকমত্য:
রসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর প্রথম যেটা করা হয়েছে, তা হলো খলিফা নির্বাচনের জন্য 'সাকিফা বনু সাঈদা'-তে সমবেত হওয়া। জানাজা দেরিতে পড়া হয়, কিন্তু খিলাফা প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত করা হয়নি। এটি ফরজিয়তের প্রমাণ।
২. উমার (রা.)-এর বক্তব্য:
"নবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর খিলাফত ছাড়া দ্বীন পূর্ণতা পায়নি। যদি কেউ খলিফা ছাড়া মারা যায়, সে জাহিলিয়তের মৃত্যুবরণ করবে।"(আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ)
৩. সাহাবীগণ খিলাফতের প্রয়োজনে ইজমা করেছেন:
চার খলিফার (খুলাফায়ে রাশেদীন) ধারাবাহিক খেলাফত ও সাহাবীদের সর্বসম্মতি ছিল। কেউ এ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে যাননি। এটি ইজমা'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

> আলিম-উলামা দের সিদ্ধান্ত

১. ইমাম নববী (রহ.):

"ইমাম বা খলিফা নিযুক্ত করা ফরজ, এ বিষয়ে উলামাদের ইজমা রয়েছে।"(শরহ সহীহ মুসলিম, ১২/২০৫)

২. ইমাম জুয়াইনি (রহ.):

"যদি দুনিয়ায় কোনো খলিফা না থাকে, তবে মুসলিমদের উপর ফরজ তাকে কায়েম করা।"(গিয়াসুল উমাম)

৩. ইবনে খালদুন (রহ.):

"খিলাফতের দ্বারা দ্বীনের হিফাজত এবং দুনিয়ার পরিচালনা হয়। তাই এটি ফরজ।"(মুকাদ্দিমাহ)

৪. মাওলানা মওদূদী (রহ.):

"খিলাফত একটি ইবাদত এবং দ্বীনের রাজনৈতিক কাঠামো। এটি কায়েম না করা শুধু গাফিলতিই নয়, বরং গুনাহ।"(খিলাফত ও মুলুকিয়াত)

৫. ইমাম আল-মাওয়ার্দী (রহ.):

"ইমামত বা খিলাফত একটি ফরজ, যাতে দ্বীন হিফাযত পায় এবং দুনিয়া সুশাসনে পরিচালিত হয়।"(আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ)

খিলাফতের ফরজিয়্যাত কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের ঐক্যমত্য এবং বিশিষ্ট ফুকাহা ও মুজতাহিদদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট। এটি নিছক ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌলিক শর্ত। খিলাফত ছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা পূর্ণতা পায় না, শরীয়াহ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এবং মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন থাকে। তাই এটি কেবল অতীত ঐতিহ্য নয়, বরং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ এবং বর্তমানের এক ফরজ দায়িত্ব।

■ মুমিনের দূরদর্শিতা এবং দ্বীনি উপলব্ধি

আধুনিক যুগে ইসলামি আকীদা ও রাজনৈতিক আদর্শ সবচেয়ে বড় যে মতবাদিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মানুষ নিজেরাই আইন প্রণেতা এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। পক্ষান্তরে, ইসলাম শিক্ষা দেয়—আল-হাকিমিয়্যাহ লিল্লাহ (الحاكمية لله): "সর্বময় কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর।" এই মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক গভীর আকীদাগত সংঘাত। একজন মুমিন কীভাবে তার ফিরাসা (বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি) ও বাছাই করার দ্বীনি সচেতনতা দ্বারা এই মতাদর্শিক সংঘাতে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে এটিই পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছি।

১. কুরআনের আলোকে মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি

আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ফুরকান'

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

" ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا"

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের জন্য একটি ‘ফুরকান’ সৃষ্টি করবেন।”

]سورة الأنفال[29 :

تفسير:

ফুরকান মানে এমন এক বোধশক্তি যা দ্বারা একজন মুমিন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয়, যে ব্যক্তি তাকওয়ার সাথে জীবন যাপন করে, আল্লাহ তার হৃদয়ে এমন একটি নূর সৃষ্টি করেন যার দ্বারা সে মতাদর্শিক বিভ্রান্তি ও সত্যের মুখোশহীন রূপকে চিনতে পারে।

>অন্তর্দৃষ্টি এক আল্লাহপ্রদত্ত গুণ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

" ﴿اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله".

“মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহর নূরের দ্বারা দেখে।”

]رواه الترمذي: 3127، وقال: حسن غريب[

تفسير:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—“ফিরাসা হচ্ছে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, যা তাকওয়া, ইখলাস ও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়।”

এটি একটি আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক বোধ, যার মাধ্যমে একজন মুমিন বুঝতে পারে, কোন ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী।

২.রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা:

ইসলামে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি কোনো গণজমায়েত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মত বা গণভোটের ওপর নয়; বরং তা বিশ্বাস ও দাওয়াহর শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। মক্কী পর্বে রাসূল (সা.) রাষ্ট্র কায়েমে সচেষ্ট হননি; বরং মানুষের আকীদা সংশোধন ও চেতনার জাগরণে মনোযোগী ছিলেন। এটি ছিল তাঁর দীর্ঘমেয়াদী দূরদর্শিতা।

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

" ﴿سيأتي على الناس سنوات خداعات، يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكَذَّبُ فيها الصادق"...

“একটি প্রতারণামূলক যুগ আসবে, সেখানে মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা হবে, আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হবে।”

]رواه أحمد والحاكم[

এই হাদীস সেই সময়কে নির্দেশ করে যেখানে রাজনৈতিক মিথ্যা ও মতাদর্শিক ফিতনা বিস্তৃত হবে—যেমনটি আমরা আজ গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমে দেখতে পাই।

>হাকিমিয়্যাতুল্লাহ ও নববী কৌশল:

মক্কায় কাফিরদের প্রস্তাব ছিল—“আসুন এক বছর আমরা আপনার ধর্ম পালন করব, এক বছর আপনি আমাদের পথ অবলম্বন করুন।” (সূরা কাফিরুন)। নবী করীম (সা.) দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

" ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"﴾

“তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।”

]سورة الكافرون[৬-১ :

এটি কোনো আপোষের রাজনীতি নয়, বরং মূলনীতি ভিত্তিক পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি। গণতন্ত্রের আকীদাগত দ্বৈতনীতি ও আপোষের প্রস্তাবের সামনে মুমিনের অবস্থানও তাই হওয়া উচিত।

৩.সাহাবায়ে কিরামের দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক নীতি নিষ্ঠা:

(ক) উমার (রা.)-এর নেতৃত্বে হাকিমিয়্যার পূর্ণ বাস্তবায়ন':

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফত ছিল গণতন্ত্রবিহীন কিন্তু জবাবদিহিমূলক। তাঁর নীতি ছিল:

" ﴿نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"

“আমরা এমন এক জাতি, যাকে ইসলাম সম্মান দিয়েছে। আমরা যদি অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজি, আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।”

]الحاكم في المستدرك[২০৪ ،

(খ) শুরা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদ:

অনেক সময় গণতন্ত্রপন্থীরা ইসলামি শুরা ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের মতো মনে করেন। কিন্তু শুরা ছিল পরামর্শ, সিদ্ধান্ত নয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সর্বদা শরিয়াহ ও খলিফার ইজতিহাদের আলোকে হত।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

" ﴿الشورى لا تساوي الحُكم، لأن الحُكم لله وحده"

“শুরা কখনো হুকুমের সমান নয়, কারণ হুকুম একমাত্র আল্লাহর।”

]الجامع لأحكام القرآن[

নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ মত, আপোষমুখী রাজনীতি বা গণভোটকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেননি। তারা দ্বীনকে কেন্দ্র করে, কুরআনের দৃষ্টিতে হক-ও-বাতিল নির্ণয় করতেন। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আজকের মুসলিমদের জন্য আদর্শ হতে পারে বিশেষ করে যখন মুসলিম বিশ্ব গণতান্ত্রিক ছদ্মবেশে শিরক ও ফিতনায় আবদ্ধ।

৪.গণতন্ত্রের আকীদাগত সংকট এবং একজন মুমিনের অবস্থান:

গণতন্ত্র মূলত একটি রাজনৈতিক মতবাদ হলেও, এর ভেতর রয়েছে এক গুরুতর আকীদাগত সংকট। কারণ, গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হল—

> "সার্বভৌমত্ব মানুষের।"

অর্থাৎ—আইন প্রণেতা, হালাল-হারামের নির্ধারক ও নীতিনির্ধারক হল জনগণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত।

পক্ষান্তরে, ইসলামের ভিত্তি হল—

" ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾"

"হুকুম কেবল আল্লাহর।"

[সূরা ইউসুফ: ৪০]

এই দ্বন্দ্বই মূল সংঘাত:

এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যকে একেবারে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে।আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণাসমূহ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

" ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾"

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফের।"

[সূরা আল-মায়েদা: ৪৪]

এই আয়াত গণতান্ত্রিক ধারায় প্রণীত আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে, কারণ তা ওহিবিরোধী এবং মানবসৃষ্ট।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

" ﴿وما جعل الله شريكًا له في حكمه فقد أشرك﴾"

"যে আল্লাহর সঙ্গে হুকুমে কাউকে অংশীদার করে, সে শিরকে লিপ্ত হয়।"

]أعلام الموقعين[١١/٣ ،

গণতন্ত্র: মতবাদ না নীতি?

গণতন্ত্রপন্থীরা প্রায়ই বলেন, “গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা।” কিন্তু বাস্তবে এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনদৃষ্টি ও বিশ্বাসমূলক কাঠামো—যেখানে মানুষের ইচ্ছাকে আল্লাহর বিধানের উপর স্থান দেওয়া হয়।

ইমাম সাইয়্যেদ কুতুব (শহীদ) বলেন:

" الديمقراطية تؤله الناس، والإسلام يعبد الله وحده"

“গণতন্ত্র মানুষকে উপাস্য বানায়, আর ইসলাম আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মানে।”

[في ظلال القرآن]

একজন মুমিনের দায়িত্বপূর্ণ অবস্থান

১. আকীদাগত অবস্থান পরিস্কার রাখা

একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক—সে গণতন্ত্রকে বিশ্বাসের জায়গা থেকে না মেনে চলে, বরং তাকে বাতিল ও গোমরাহি হিসেবে চিহ্নিত করে।

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

" فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى"

“যে তাগূতের সঙ্গে কুফর করে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে সত্যিকার মজবুত দড়ি ধরেছে।”

[সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]

গণতন্ত্র এক প্রকার “তাগূত”—যে শরিয়াহকে বাদ দিয়ে মানুষের মতকে সর্বোচ্চ মান্যতা দেয়।

২. দ্বীনি দাওয়াহ ও চিন্তাশীলতা

একজন মুমিন যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করে, তখন তার কর্তব্য—এই ভ্রান্ত ব্যবস্থার আসল চেহারা দাওয়াহর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরা।

ইবন তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন:

" البيان والتبليغ من شروط القيام بحجة الله"

“আল্লাহর পক্ষ থেকে হুজ্জত প্রতিষ্ঠা করতে হলে সত্য স্পষ্টভাবে জানানো জরুরি।”

[الفتاوى: ٢٥/١٦٧]

গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন ও বিশ্বাসব্যবস্থা, যা ইসলামের সঙ্গে তীব্র বিরোধপূর্ণ। একজন মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি তাকে এই ফিতনা থেকে বাঁচায় এবং তাকে সত্যের উপর অবিচল রাখে। আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গঠিত এই চিন্তাশক্তিই তাকে নেতৃত্ব, হিদায়াত ও দাওয়াহর পথে উত্তীর্ণ করে।

৫.বর্তমান যুগে মুসলিম নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও দীনভিত্তিক প্রস্তুতি:

আধুনিক ফিতনার জালে আজ মুসলিম নেতৃত্ব। বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র 'ইসলামী' নাম ধারণ করলেও বাস্তবে তা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীন। এর ফলে:আল্লাহর বিধানকে দ্বিতীয় শ্রেণির বানানো হয়েছে।

আইন প্রণয়নের দায়িত্ব চলে গেছে জনগণ বা নির্বাচিত সংসদের হাতে।

'ধর্ম' relegated to ব্যক্তিগত পরিসরে, রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন।

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُه"...

"মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবল নামটুকু বাকি থাকবে..."

[رواه البيهقي في شعب الإيمان]

এ হাদীস যেন আজকের নামধারী 'ইসলামী' রাষ্ট্রসমূহের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

নেতৃত্বের দৈন্য ও দীনচ্যুতিই মূল সংকট। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব অনেকাংশে ধারাবাহিকভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত । দ্বীনকে সুবিধাবাদীভাবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। জ্ঞান ও আমলের ভিত্তিতে নেতৃত্ব তৈরি না হয়ে জনপ্রিয়তা বা পার্টির উপর নির্ভর করে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:

" فساد الراعي سبب فساد الرعية"

"নেতার অবনতি হলে অনুসারীরাও পথভ্রষ্ট হয়।"

[إحياء علوم الدين]

এমন নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে দ্বীনের প্রকৃত নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

দীন-ভিত্তিক প্রস্তুতি ও ঈমানদার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য>

(১) আকীদাভিত্তিক নেতৃত্ব:

একজন প্রকৃত মুসলিম নেতা কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা, মতামত কিংবা পশ্চিমা মডেলের শাসনব্যবস্থায় নিজেদেরকে সংহত করার কথা ভাবেন না। বরং, তার দর্শন হয়—

" إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه"

"ইমাম (নেতা) হল এক ঢাল, যার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যাকে সামনে রেখে আত্মরক্ষা করা হয়।"

[صحيح البخاري: ২৯৫৭]

(২) দ্বীন, দাওয়াহ ও দায়িত্ববোধ:

আজকের মুমিনদের, বিশেষ করে আলেম, ছাত্র ও চিন্তাশীলদের উচিত:

√দ্বীন বুঝে নেতৃত্বে প্রস্তুত হওয়া;

√ফিতনা চেনা ও পরিহার করা;

√দাওয়াহ, চিন্তা ও লিখনীর মাধ্যমে বিকল্প রূপরেখা উপস্থাপন করা।

ইমাম হাসান আল বান্না (রহ.) বলেন:

" المعركة اليوم معركة فكر، وعلينا أن نُعدّ العقول كما نُعدّ السلاح"

“আজকের যুদ্ধ মতাদর্শের যুদ্ধ; আমাদের উচিত মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করা, যেমন অস্ত্র প্রস্তুত করা হয়।”

(৩) খিলাফত চেতনা ও ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণ: ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

খিলাফত শুধু একটি শাসনব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি বিশ্বাসের দিকনির্দেশনা—যা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাস্তবায়নের নামে পরিচিত। একে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হল:

√উম্মাহকে তাগূতী শাসন থেকে মুক্ত করা;

√ওহি-ভিত্তিক আইন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা;

√ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হিদায়াতের পথ প্রস্তুত করা।

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ"...

“আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন।”

[সূরা নূর: ৫৫]

আজকের বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত কেবল শাসনব্যবস্থার সংঘাত নয়; বরং তা হল **আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত**। একজন মুমিন তার দূরদর্শিতা, দীনি উপলব্ধি, ইলম ও ঈমান দ্বারা এই সংঘাতকে চিহ্নিত করে, ফিতনার জাল ছিন্ন করে এবং সত্যের পথে অবিচল থাকে। সে বুঝে—কোন পথ আল্লাহর এবং কোনটি তাগূতের।

■ বস্তুবাদী সভ্যতার শেষ পরিণতি

বস্তুবাদ ও গণতন্ত্র মূলত—একই বৃক্ষের দুই শাখা।বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যে তথাকথিত গণতন্ত্রের পতাকাতলে পরিচালিত হচ্ছে, তার মূল ভিত্তি হলো বস্তুবাদ (Materialism)। গণতন্ত্র একদিকে যেমন মানুষকে নিজের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে, অন্যদিকে সে ধর্ম, আখিরাত, নৈতিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধিকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ

করে রেখেছে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন এক ধারা চালু হয়েছে যেখানে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভোগ, সুবিধা, প্রতিযোগিতা ও স্বার্থপরতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম এবং ক্যাপিটালিজম—এই ত্রয়ী শক্তি বস্তুবাদী সভ্যতার প্রধান চালিকা শক্তি। অথচ এই সভ্যতার হৃদয়হীন উন্নয়ন, নৈতিক অবক্ষয় ও আত্মিক দেউলিয়াত্ব আজ বিশ্বমানবতাকে চরম পরিণতির দিকে ধাবিত করছে।

গণতন্ত্র যে দার্শনিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা নিচের কয়েকটি স্তম্ভে গঠিত:

ক. ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism):

গণতন্ত্র ধর্মকে রাষ্ট্র ও আইনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ইসলাম যেখানে আল্লাহর দেওয়া শরিয়াহকে চূড়ান্ত বিধান মনে করে, গণতন্ত্র সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলে গণ্য করে। এর ফলে রাষ্ট্র থেকে তাওহীদ ও রিসালতের ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

খ. মানুষ-কেন্দ্রিকতা (Anthropocentrism):

মানবজাতির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এখানে সকল বিধানের ভিত্তি। অথচ আল্লাহ বলেন:

“ دأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ” ◌ُ

“সৃষ্টি ও হুকুম তো একমাত্র তাঁরই।” (সূরা আ’রাফ: ৫৪)

গ. ভোগবাদিতা ও স্বাধীনতা:

গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ভোগের নামে এমন এক জীবনব্যবস্থা তৈরি করেছে যেখানে মানুষের কর্ম, জীবনযাপন ও মূল্যবোধ কেবলই দুনিয়াবাদী সফলতার দিকে ধাবিত। এতে ঈমান, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা ও আখিরাতের ভয় জায়গা পায় না।

বস্তুবাদী সভ্যতার সমাজ বাস্তবতার বাস্তবতা আসলে কি? কেমন?

(১) পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংস:

পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সমাজে বিবাহপ্রথা বিলুপ্তপ্রায়। যৌন স্বাধীনতা, সমকামিতা, একক মাতৃত্ব, চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক ইত্যাদি আজ পারিবারিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে। এর ফল হলো সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, শিশুদের মানসিক রোগ, বৃদ্ধ পিতামাতার নির্জনতা এবং আত্মহত্যা।

(২) আত্মিক দেউলিয়াত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়:

আত্মা ও হৃদয়ের জগতে চরম শূন্যতা বিরাজ করছে। বহু উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে বিষণ্নতা, ডিপ্রেশন, আত্মহত্যা ও মানসিক রোগের হার ভয়াবহ। কারণ, বস্তুবাদ কেবল বাহ্যিক সফলতা দিতে পারে; আত্মিক প্রশান্তি নয়।

(৩) পরিবেশ ও মানবিকতা ধ্বংস:

বস্তুবাদী উন্নয়ন প্রকৃতি ধ্বংস করছে। উদাহরণস্বরূপ: বিশ্ব উষ্ণায়ন, পানিদূষণ, বন উজাড়, প্রাণিবৈচিত্র্যের বিলুপ্তি—all in the name of progress. এই উন্নয়ন প্রকৃত মানবিক উন্নয়ন নয়, বরং ধ্বংসের রূপ।

(৪) অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য:

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ হাত মিলিয়ে সমাজে এক ভয়াবহ শ্রেণিচ্যুতি সৃষ্টি করেছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরিব দারিদ্র্যসীমার নিচে ধাবিত হচ্ছে। মানবতা আজ পুঁজির গোলামে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বহু জাতির পতনের পেছনে তাদের বস্তুবাদী মানসিকতা, অহংকার ও আখিরাত অস্বীকারকে দায়ী করেছেন।

(১) কারুন: "তাকে আমি এত সম্পদ দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো বহন করতেও শক্তিশালী দল ক্লান্ত হতো..."

(সূরা কাসাস: ৭৬-৮১)

কারুন সম্পদের অহংকারে চরম সীমা লঙ্ঘন করেছিল; তার ফলাফল হলো সম্পদসহ ভূগর্ভে বিলীন।

(২) আদ ও সামূদ জাতি:তারা সভ্যতা, প্রযুক্তি ও স্থাপত্যে উন্নত হলেও রাসূলের আহ্বান অস্বীকার করায় আল্লাহ তাদের বাতাস, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন।

> "তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাতো, নিরাপদ জীবন যাপন করতো। তবু তারা ধ্বংস হলো, কারণ তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করেছিল।"

(সূরা হিজর: ৮২-৮৪)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ তাওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। এখানে মানুষের উন্নয়ন মানে কেবল বাহ্যিক নয়, বরং আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। ইসলাম বলে:

আল্লাহই হুকুমদাতা: গণতন্ত্র যেখানে মানুষকে আইনদাতা বানায়, ইসলাম সেখানে আল্লাহর হুকুমকে সর্বোচ্চ বলে ঘোষণা করে।

" دإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"ِ

(সূরা ইউসুফ: ৪০)

উন্নয়ন = তাকওয়া ও ন্যায়বিচার:

> "যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল, সে সফল।"

(সূরা আশ-শামস: ৯)

সাম্য ও মানবিকতা:

ইসলাম সব ধরণের অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও মুনাফাখোর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। জাকাত, সদকা, ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি একটি প্রকৃত মানবিক সমাজ গড়ে তোলে।

বস্তুবাদ হলো গণতন্ত্রের আত্মা; আর তাওহীদ ও শরিয়াহ হলো ইসলামের প্রাণ। এই দুই দর্শনের পথ কখনো এক হতে পারে না। বস্তুবাদ যেখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র গড়ে তোলে, ইসলাম সেখানে মানুষকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে চিনে তার জীবনের প্রতিটি স্তরে হেদায়াত চায়।

গণতন্ত্র যত উন্নতই হোক, তার শেষ পরিণতি হবে ধ্বংস, কারণ:

*এটি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে।

*এটি আখিরাতকে ত্যাগ করে দুনিয়াকে গন্তব্য বানায়।

*এটি সমাজে অসাম্য, শোষণ ও মানসিক বিভ্রান্তি ছড়ায়।

অতএব, ইসলামের বিকল্প না, বরং ইসলামের বিরুদ্ধেই গণতন্ত্র দাঁড়ায়। বস্তুবাদী সভ্যতার পরিণতি—তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনো মতাদর্শে—চূড়ান্তভাবে ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।

মানবজাতি যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছার পূজায় লিপ্ত হয়, তখন সভ্যতা হয় বাহ্যিকভাবে ঝলমলে, কিন্তু ভিতরটা থাকে ফাঁপা। গণতন্ত্র এই বস্তুবাদী নব্য-ফিরআউনী ব্যবস্থা—যা বাহ্যিক উন্নয়ন দেখালেও ঈমান, তাকওয়া, নৈতিকতা ও আখিরাতচেতনার ধ্বংস ডেকে আনে।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বিকল্প সভ্যতা। এই সভ্যতার ভিত্তি হলো:

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, নবুয়তের নেতৃত্ব, শরিয়াহর বিধান ও আখিরাতমুখী উন্নয়ন। বস্তুবাদী সভ্যতা যেখানে পতনের পথে, ইসলাম সেখানে পথ দেখায় চূড়ান্ত মুক্তির।

ষষ্ঠ অধ্যায় - মুসলিম বিশ্বে গনতন্ত্রের বাস্তবতা

■ মিশ্র সভ্যতা ও বিচ্ছিন্নতার পরিণতি

ইসলামী সভ্যতা মূলত একটি তাওহিদভিত্তিক, সার্বিক জীবনব্যবস্থা। এর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। কিন্তু আধুনিক মুসলিম বিশ্বে এই শুদ্ধ সভ্যতার মাঝে পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তাধারার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, আইন, এমনকি সংস্কৃতির ভেতরেও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক চিন্তা ঢুকে পড়েছে, যার ফলে মুসলিম সমাজ একধরনের মিশ্র সভ্যতার শিকার হয়েছে। এই সভ্যতা neither fully Islamic nor fully secular—বরং একটি দ্বৈত চরিত্রের বাহক, যা চিন্তা, বিশ্বাস ও রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

এই মিশ্র সভ্যতা মুসলিমদের আত্মপরিচয়ে এক ধরণের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। একজন মুসলিম ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি অনুশাসন মানলেও, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তাকে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে বিশ্বাস ও বাস্তবতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমন দ্বৈততা ব্যক্তির চিন্তা ও চরিত্রে দুর্বলতা ডেকে আনে, এবং ধীরে ধীরে সমাজে এক গভীর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

এর পাশাপাশি মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতার গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। ইসলাম একটি বৈশ্বিক উম্মাহ ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতীয়তাবাদ, সীমানা ও ভাষাভিত্তিক বিভাজনকে উৎসাহিত করে। একসময়ের ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব আজ শত শত ছোট ছোট “জাতীয় রাষ্ট্রে” বিভক্ত, যাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অনাস্থা এবং প্রতিযোগিতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল ভূগোলিক নয়, বরং চিন্তাগত ও রাজনৈতিকও বটে। এক দেশের মুসলিম যদি শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করতে চায়, অন্য দেশের মুসলিমদের একটি অংশ সেটিকে “চরমপন্থা” বলে অভিহিত করে। এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং একটি সামষ্টিক, ইসলামী রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার পথ ব্যাহত হয়।

এই অবস্থা কুরআনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, “এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো; অন্য পথ অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।” (সূরা আন’আম, ৬:১৫৩)। এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলামে চিন্তার ও পথের ঐক্য অপরিহার্য। অথচ গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় পথের

বহুত্ব (pluralism) এবং মতের স্বাধীনতা (freedom of opinion) এমনভাবে গৃহীত হয়, যা ইসলামের তাওহিদী দর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই দ্বৈত সভ্যতা এবং বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতে মুসলিম সমাজে যে মানসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতা তৈরি হয়েছে, তা মুসলিমদের নেতৃত্বের অক্ষমতা এবং আত্মগৌরবের অভাবে পরিণত হয়েছে। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায়, ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের জায়গায় সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন পশ্চিমা আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র ও উম্মাহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

এই বাস্তবতা থেকে উত্তরণে প্রয়োজন একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা—এতে অন্য কোনো সভ্যতার সংমিশ্রণ গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব পুনরায় ঐক্য, আত্মপরিচয় এবং নেতৃত্ব ফিরে পেতে পারে।

যদি কোন দেশ চোখ- কান বন্ধ করে আধুনিক সভ্যতার পরাক্রমী চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করার চেষ্টা করে,অথবা তাকে একেবারে পাত্তা না দিয়ে সুখনিদ্রায় দিনাতিপাত করতে চায় এবং নিজের সীমিত পৃথিবীর বাইরে যেতে প্রস্তুত না হয়, তবে সেই দেশটির বেশিদিন স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বহাল থাকবে না। সেই সাথে এই অবস্থান সৃষ্টি তাত্ত্বিক নিয়ম শৃঙ্খলা এবং মহাবিশ্বের মেজাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোন দেশ জোরপূর্বক এই প্রকৃতি বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে, তবে এই সভ্যতা তার ঘরে ও পরিবারের সেভাবেই ঢুকে পড়বে, যেভাবে বন্যার জল বিনা নোটশেই প্রবেশ করে গ্রাম-শহর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

আধুনিক সভ্যতার অভিঘাত থেকে কোন মুসলিম দেশ সুরক্ষিত থাকলেও,তার আচল এর মন্দ দ্বারা কলুষিত না হলেও, এর উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকরণ সংস্থান থেকে হাত গুটিয়ে নিজের সীমাবদ্ধ জগতে আবদ্ধ থাকলেও, এই কাল পর্ব বা পর্যায়টি খুব বেশি স্থায়ী হয়নি । এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাক্রম তাকে ক্রমশ আক্রান্ত করেছে এবং তার শান্তি ও নিরাপত্তার স্বপ্ন কে করেছে বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত।

মশহুর পশ্চিমা পণ্ডিত মুহম্মদ আসাদ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আরব উপদ্বীপে ভ্রমণ করেন, যা সে অবধি প্রাচীন আরব এবং ইসলামী ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখনও তাতে অনুপ্রবেশ করেনি। আধুনিক প্রাযুক্তিক উপায় উপকরণ তখনও বালুকাময় প্রাচীরের বেষ্টনী অতিক্রম করতে পারেনি। এ সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে এই বিচ্ছিন্নতা,

পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব থেকে দূরত্ব রক্ষা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারবে কিনা মর্মে তিনি তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :
“আমি বিচার বিবেচনা করে এই জিজ্ঞাসায় উপনীত হলাম যে, যায়েদ এবং যায়েদ এর কওম(আরব) কতদিন ধরে তারা নিজেকে এই খতরা থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে,যা অজস্র হিলা-বাহানায় তাদের ঘেরাও করছে এবং কোন প্রকার ভদ্রতা ও সৌজন্য ব্যতিরেকেই তাদের উপর অচিরেই আরোপিত হতে চলছে । আমরা এমন এক সময় বসবাস করছি, যখন প্রাচ্য ধেয়ে আসা পাশ্চাত্যের মোকাবেলায়, যা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে অসহায় করে তুলছে।যার দরুণ নিরব, নির্বোধ, নিরপেক্ষ মঞ্চদর্শক হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। অসংখ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংঘবদ্ধ শক্তি বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের দরজায় কড়া নাড়ছে। ইসলামী বিশ্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আত্মসমর্পণ করে এই সংঘাতের পরিণতিতে কেবল নিজের ঐতিহ্যবাহী কাঠামোয় খাওয়াবে না বরং আধ্যাত্মিক শিকড় ও সংযোগও হারিয়ে বসবে?

মুহম্মদ আসাদের উদ্বেগ বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। এ সময় কাল দীর্ঘ হতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামী বিশ্বের এই পবিত্র কেন্দ্রে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রযুক্তি, পাশ্চাত্য পণ্য সামগ্রী বন্যার মতো আছড়ে পড়ে। বিলাসী উপকরণ এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বাজার -ঘর ছেয়ে যায়। জীবনের সারল্য, সংযম, বীরত্ব এবং উদ্যম ইত্যাদি গুণাবলী অদৃশ্য হয়ে যায় ;যা আদিকাল থেকেই আরবদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।
আরব উপদ্বীপ এবং পশ্চিমের এই নব্য কুটুম্বীতা হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং পলিটিক্স ও পেট্রোলের পথ ধরে। এই আদান-প্রদান ও সুবিধা গ্রহণ হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রজ্ঞাহীন ভাবে । এর পিছনে ভারসাম্যময় চিন্তা বা সুচিন্তিত পরিকল্পনা কোনটাই ছিল না। আর তাই পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ, যার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন আসাদ, একটি বাস্তব ঘটনা হয়ে হাজির হয়েছে এবং ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং বাহ্যিক রূপান্তরের পর, এখন এই দেশের আধ্যাত্মিক শেকড়-সম্বন্ধ ও সেই ঝড়ের কবলে পতিত হয়েছে ।
আরব উপদ্বীপ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর রোপিত বাগান এবং তার দাওয়াতের ফসল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রসূল (সা:) এর পয়গম্বর সুলভ এবং প্রজ্ঞাপুর্ণ ওসিয়ত অমুসলিমদের শুধুমাত্র শারীরিক বহিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ;বরং তাদের সকল ধরনের প্রভাব এবং তাদের প্রচার ও সংস্কৃতির অপসারণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেটা বিবেকবান মানুষ মাত্রই বুঝতে পারেন।

সুতরাং যদি পশ্চিমা সভ্যতার ওপর পর্যালোচনা মূলক এবং তো সুলভ দৃষ্টিপাত করা যেত, এবং (যা কিছু শুভ্র সুন্দর তাই গ্রহণ করো ;অসুন্দর আবর্জনা সব বর্জন কর) এর প্রাচীন ইসলামী ও আরবিনীতির অনুসরণ করা হতো তাহলে ভূমির দিকে বন্যার মত ধেয়ে আসতো না ।

■ তুরস্ককে পশ্চিম বানানোর প্রয়াস এবং কারণ

ঐতিহাসিকভাবে উসমানী খেলাফত মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে এই সাম্রাজ্য ইসলামী আইন, শাসন ও সামরিক শক্তির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। তবে উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির সামরিক ও প্রযুক্তিগত প্রাধান্য, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনার ফলে উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় বিজয়ী শক্তিরা ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফতের অবসান ঘটায়। এই সময়েই তুর্কি মিলিটারি কমান্ডার মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি একটি ‘আধুনিক’, ‘জাতীয়’ ও ‘পশ্চিমমুখী’ রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

এই রূপান্তরের প্রথম ধাক্কা আসে রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামোয়। ইসলামি শরিয়াহ্-ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে তিনি সুইস সিভিল কোড ও ইতালীয় ফৌজদারি আইন প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় আদালত, ওয়াক্ফ, মাদরাসা, এমনকি ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে কার্যত অকার্যকর করে দেওয়া হয়। তুরস্কের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বাদ দেওয়া হয়, মসজিদের ভূমিকা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং আজান তুর্কি ভাষায় দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় (যা পরে পুনরায় আরবিতে ফেরত আনা হয়)। এই পদক্ষেপগুলো প্রমাণ করে যে আতাতুর্ক কেবল একটি রাজনৈতিক রূপান্তর নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন—যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী পরিচয়ের মূলোচ্ছেদ।

একই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও পাশ্চাত্য চিন্তায় গড়ে তোলা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রভাব সীমিত করা হয়। ধর্মীয় পোশাক, বিশেষ করে হিজাব, নিষিদ্ধ করা হয় এবং পুরুষদের ইসলামি টুপি (ফেজ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আরবি লিপির পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করা হয় যাতে জনগণের কোরআন ও হাদীসের সাথে সংযোগ দুর্বল হয় এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে প্রজন্মের

ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি ঐতিহ্য থেকে একটি সেক্যুলার জাতীয় পরিচয়ের দিকে জনগণকে ঠেলে দেওয়া।

তুরস্কের এই রূপান্তরের আরেকটি অনুধাবনযোগ্য দিক হলো এর ভূরাজনৈতিক চেতনা। আতাতুর্ক বুঝেছিলেন, পশ্চিমা শক্তির সমর্থন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক বলয়ে প্রবেশ করতে হলে তাকে একটি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে পুনর্গঠন করতে হবে। এই লক্ষ্যেই তিনি ইউরোপীয় আইন গ্রহণ করেন, পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাক বাধ্যতামূলক করেন এবং ইসলামি রাজনৈতিক ভাষ্যকে নিষিদ্ধ করেন। সুতরাং এটি কেবল একটি অভ্যন্তরীণ সংস্কার ছিল না, বরং ছিল একটি ভূরাজনৈতিক কৌশল, যার মাধ্যমে তুরস্ক পশ্চিমা বিশ্বে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে চেয়েছিল।

এই 'পশ্চিমায়নের' প্রক্রিয়া একদিকে যেমন তুরস্ককে বাহ্যিক আধুনিকতার মুখপত্রে পরিণত করে, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, নেতৃত্ব এবং খিলাফত ব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তুরস্কের নেতৃত্বে থাকা ইসলামী আত্মপরিচয়-নির্ভর রাষ্ট্রটি হঠাৎ করেই হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ, ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী এবং পশ্চিমা অনুগত একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। এই রূপান্তর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সেক্যুলার আন্দোলনের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বহু আরব ও অ-আরব দেশে এ ধারা অনুসরণ শুরু হয়।

তবে এই রূপান্তর নিঃসন্দেহে সমাজে একটি দ্বৈত চেতনার সৃষ্টি করে। একদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আইন ছিল পশ্চিমা, অন্যদিকে সাধারণ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কৃতি ও জীবনধারা ছিল ইসলামি ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। এই দ্বন্দ্ব পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন, রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ ও ইসলামী দলগুলোর উত্থানের কারণ হয়। রেফারেন্সযোগ্যভাবে দেখা যায় যে, নব্বই দশকের পর তুরস্কে ইসলামপন্থীদের পুনরুত্থান, যেমন—এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন একে পার্টির উত্থান, এই ঐতিহ্যবাহী দ্বন্দ্বেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে, আতাতুর্কের পশ্চিমায়ন ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বহীন করে দেয় এবং পশ্চিমা সভ্যতার আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়। অথচ খেলাফতের ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত তুরস্ক ছিল উম্মাহর এক কেন্দ্রীয় শক্তি। তাই তুরস্ককে পশ্চিম বানানোর প্রচেষ্টা মুসলিম বিশ্বের জন্য

একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়, যা আজও উম্মাহর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের আলোচনায় কেন্দ্রে অবস্থান করে।

■ ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ

ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে শুধু একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক মেরুকরণও গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে প্রাচ্য, অর্থাৎ ইসলামী ও হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্মীয় জীবনচর্চা ও নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় প্রতীচ্য—অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ ও উপনিবেশিক আধিপত্যের একটি সুবিন্যস্ত তত্ত্ব। এই দ্বন্দ্ব কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়, শিক্ষাব্যবস্থা, চিন্তাচর্চা এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বেও গভীর প্রভাব ফেলে।

প্রথমেই বলা দরকার, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যার সর্বোচ্চ রূপ দেখা যায় মোগল আমলে। এই সময়ে সমাজব্যবস্থা, আইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের ছাপ স্পষ্টভাবে বিরাজমান ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল মাদরাসাভিত্তিক, যেখানে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, যুক্তি ও ভাষাশাস্ত্র পড়ানো হতো। বিচারব্যবস্থাও শরিয়াহ-নির্ভর ছিল, যা জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পর ধীরে ধীরে এই কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, ম্যাকলে মিনিট, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আরোপের ফলে একটি নতুন শ্রেণির জন্ম হয়—যারা ছিল ইংরেজি জানা, পাশ্চাত্য মনোভঙ্গির মানুষ, যাদের নিজ সংস্কৃতির প্রতি ছিল অবজ্ঞা ও দূরত্ব। এই শ্রেণিকে বলা হতো “ব্রাউন ইংলিশম্যান”—চামড়ায় ভারতীয়, কিন্তু চিন্তায় ইউরোপীয়। এই শ্রেণিই পরবর্তীকালে নেতৃত্ব নেয় নতুন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির, কিন্তু তাদের ভাবনার মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র ধারণার জায়গা অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত ছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে শিক্ষাক্ষেত্রে। মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষার সাথে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস রক্ষার সংগ্রাম, অপরদিকে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে চাকরি ও সামাজিক অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা। এই দ্বৈত টানাপোড়েন থেকেই উদ্ভব হয় আলিগড় আন্দোলনের, যার নেতৃত্ব দেন স্যার সায়্যেদ

আহমদ খান। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান, কিন্তু একে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেন। ফলে মুসলিম সমাজে একটি দ্বি-মুখী ধারা শুরু হয়—একটি অংশ ধর্মে দৃঢ়, অপর অংশ পাশ্চাত্য মনস্ক কিন্তু শিকড়হীন।

এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলে। মুসলিম নেতৃত্ব একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রতীচ্য ঘরানার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়, অন্যদিকে মুসলিম লিগের মতো সংগঠন ইসলামী পরিচয়ভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চায়। এই দ্বন্দ্বের শিকড় প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দার্শনিক দ্বৈরথে নিহিত। মুসলিম লিগের দাবি ছিল, মুসলমান কেবল ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, বরং একটি পৃথক 'জাতি' যার নিজস্ব আইন, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা রয়েছে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের দাবি ছিল একটি একক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের।

ভারতবর্ষে এই দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল চিন্তার আগ্রাসন। পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে লিবারেলিজম, ন্যাচারালিজম, ডারউইনিজম ও র‍্যাশনালিজম মুসলিম চিন্তাবিদদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কেউ কেউ ইসলামের শিক্ষাকে এই তত্ত্বের আলোকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মঘাতী অবস্থানে চলে যান। ফলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্থানে মানুষকে বসানো, ধর্মকে ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার মত বিপজ্জনক চিন্তা প্রবেশ করে মুসলিম সমাজে। এভাবে তাওহীদ-ভিত্তিক চিন্তা ও গণতন্ত্র-ভিত্তিক চিন্তার মাঝে একটি পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য দ্বন্দ্বের ফলাফল ছিল ভয়াবহ। একদিকে মুসলিম সমাজ তাদের ঐতিহ্যগত চিন্তা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক শক্তি হারায়; অন্যদিকে আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়ে পশ্চিমের প্রণীত মডেলকেই মুক্তির উপায় মনে করে। যদিও পাকিস্তান আন্দোলন প্রমাণ করে যে ইসলামী রাষ্ট্রধারণা এখনও জীবন্ত, তবে এর বাস্তবায়নে বহু সংকট, বিভ্রান্তি ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যার মূল উৎস এই চিন্তাগত দ্বন্দ্ব।

■ আরব বিশ্বে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রধান পথিকৃৎ

ঔপনিবেশিক যুগের সূচনা ও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগে পশ্চিমা চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ আরব সমাজে এক গভীর দার্শনিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রদর্শন ও সমাজ কাঠামোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতাবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং মানবতাবাদী মূল্যবোধ। এই প্রভাবে আরব সমাজে

একদল চিন্তাবিদ ও সংস্কারক জন্ম নেয়, যারা ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজের ধারা পরিবর্তন করে পাশ্চাত্য ঘরানার রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এসব পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বগণ কখনও সরাসরি, কখনও চিন্তা ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পশ্চিমা চিন্তা আরব মননে রোপণ করেন।

এই চিন্তাধারার প্রাথমিক বাহক হিসেবে গণ্য করা হয় রিফর্মিস্ট (সংস্কারবাদী) চিন্তাবিদদের। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রিফা'আ আত-তাহতাওয়ী (Rifa'a al-Tahtawi), যিনি ফ্রান্সে পাঠরত অবস্থায় পাশ্চাত্য দর্শনের গভীর প্রভাবে পড়েন। তিনি ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখায় ফরাসি বিপ্লব, গণতন্ত্র ও মানবিক মর্যাদার মূল্যবোধকে উচ্চস্তরে তুলে ধরা হয়। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল একটি আধুনিক রাষ্ট্র, যা ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে সহনীয় মনে করে। এভাবে তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেখার ধারণা আরব বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজে পরিচিত করে তোলেন।

এরপর আরও তীব্রভাবে পাশ্চাত্য ধারণা প্রবর্তন করেন আলী আবদুর রাজিক। তাঁর বই الإسلام وأصول الحكم (ইসলাম ও শাসনের মূলনীতি) মুসলিম দুনিয়ায় প্রবল বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি দাবি করেন, ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক ধর্ম; এর সাথে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কেবল ধর্মীয় নেতা ছিলেন; রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। এই ধারণা মূলত ইউরোপীয় লিবারেল চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিফলন—যেখানে ধর্ম ব্যক্তিগত, রাষ্ট্র সাংবিধানিক এবং ধর্মীয় আইন সমাজ-রাষ্ট্রে কার্যকর নয়। এই বইয়ের মাধ্যমে রাজিক আরব সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে প্রথম একাডেমিক ভিত্তি গড়ে দেন।

অপর এক পথিকৃৎ তাহা হুসাইন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং সাহিত্য ও ইতিহাস বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে ইসলামি ঐতিহ্যের সমালোচনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আরব সভ্যতা মূলত গ্রীক ও রোমান বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরি এবং কুরআনের ভাষাও মানুষ-নির্মিত। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইতিহাসকে নিছক সাহিত্য ও উপাখ্যান হিসেবে বিশ্লেষণ করেন, যা পরবর্তীতে কুরআনের ঐশীবাণী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতাকে আঘাত করে। তাহা হুসাইন পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাকে আরব বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করে তোলার অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়াও জামালুদ্দিন আফগানী ও তাঁর অনুসারী মুহাম্মদ আবদুহ ইসলামি পুনর্জাগরণের নামে পাশ্চাত্য চিন্তাকে ধর্মীয় ভাষ্য দ্বারা বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে আধুনিক চ্যালেঞ্জের মুখে টিকিয়ে রাখা, তবুও তারা যে 'আধুনিকতা' গ্রহণ করেন, তা ছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতা—যার ভিত্তি ছিল ধর্মহীন যুক্তিবাদ। আবদুহ ইসলামের সমাজবিধান ও শরিয়াহ্‌র অনেক দিককে পুনর্ব্যাখ্যা করেন যাতে তা পশ্চিমা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। ফলে তার ব্যাখ্যাগুলো পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সহাবস্থানের ধারণার ভিত্তি গড়ে তোলে।

এই চিন্তাবিদদের প্রভাবে আরব বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চা, আইনি কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় পশ্চিমা প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। আল আজহারসহ অনেক প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য দার্শনিক তত্ত্ব প্রবেশ করে এবং ছাত্রদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে ইউরোপ। এই দ্বৈত অবস্থান বহু চিন্তাবিদের মাঝে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করে এবং এক সময় তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও শরিয়াহ্‌র ধারণাকে মধ্যযুগীয় ও অনুপযোগী বলে বাতিল করে দেয়।

এভাবে আরব বিশ্বের বেশিরভাগ আধুনিক চিন্তাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী ধর্মকে ব্যক্তি জীবনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রেখে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের পক্ষে মত দেন। তারা পশ্চিমা শিক্ষা ও চিন্তা ব্যবস্থাকে মুক্তির উপায় মনে করেন এবং ইসলামের রাজনৈতিক দিকগুলোকে অস্বীকার করেন। এর ফলে মুসলিম জনমানসে একটি চিন্তাগত দ্বিধা তৈরি হয়—ইসলাম কি শুধুই আধ্যাত্মিক ধর্ম, না কি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা?

এই পথিকৃৎদের চিন্তাভাবনা আরব বিশ্বে যে জ্ঞান ও দার্শনিক বিপর্যয়ের সূচনা করে, তার প্রভাব আজও বিদ্যমান। তারা পাশ্চাত্য চিন্তাকে অনুকরণযোগ্য মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং ধর্মকে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজের গঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এই ধারার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় পরবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান ও রাজনৈতিক কাঠামোয়—যেখানে ইসলামকে সাংবিধানিক রেফারেন্স হিসেবে রাখা হলেও বাস্তব আইন ও প্রশাসনে পাশ্চাত্য মূল্যবোধই পরিচালনাকারী।

■ মিশরে প্রাচ্যবাদীদের কণ্ঠস্বর

১৮শ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু করে ২০শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মিশর ছিল প্রাচ্যবাদী চিন্তার এক বিস্তীর্ণ পরীক্ষাগার, যেখানে ইসলামি সভ্যতার পুনরুত্থানকে প্রতিহত করতে পাশ্চাত্য দার্শনিক পদ্ধতি, ইতিহাসচর্চা ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাঠামো প্রয়োগ করা হয়। এই প্রয়োগ সরাসরি উপনিবেশবাদী শক্তির পক্ষ থেকে নয়, বরং তাদের দ্বারা তৈরি এক শ্রেণির মুসলিম চিন্তাবিদ ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যারা 'আধুনিকতা' ও 'জাতীয় উন্নয়ন' নামের মোড়কে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ রূপে উপস্থাপন করেন।

মিশরের প্রাচ্যবাদী চিন্তাশীলদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো—তারা মুসলিম সমাজে এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক পটপরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল, পশ্চিমা আধুনিকতার মৌল উপাদানসমূহ—যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, ও গণতন্ত্র—এই উপাদানগুলোর সন্নিবেশ ছাড়া মুসলিম সমাজ কখনোই উন্নত হতে পারবে না। এই প্রচারণা কখনো সরাসরি ইসলামবিরোধী না হলেও ইসলামকে একান্তই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনযাপনের 'ব্যক্তিগত' উপাদান হিসেবে রূপান্তর করার সূক্ষ্ম কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মিশরে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা চিন্তাবিদদের মধ্যে কয়েকজন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। তাহা হুসাইনকে আবারও আলোচনায় আনা প্রয়োজন, তবে এবার তার ভূমিকার ভিন্নতর বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি কেবল কুরআন বা আরবি সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রশ্নবিদ্ধ করেননি, বরং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পার্থক্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেখানে ইসলামি সংস্কৃতি কেবল একটি 'তৃতীয় বিশ্বের' মানসিক কাঠামো হিসেবে চিত্রিত হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্র বা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অক্ষম।

এই চিন্তাধারার একাধিক দিক ছিল। প্রথমত, তারা ইসলামি আইন বা শরিয়াহ্-কে একটি ইতিহাসনির্ভর পদ্ধতি হিসেবে চিত্রিত করেন, যার কোনো সমসাময়িক কার্যকারিতা নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁরা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রেফারেন্সকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। যেমন সালামা মুসা দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ফ্রয়েড, মার্কস, নীটশে, এবং ডারউইনের চিন্তাকে গ্রহণ করে ইসলামি সমাজচিন্তার বিকল্প কাঠামো

দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এতে ইসলামি বিশ্বাসব্যবস্থাকে ঐতিহ্যিক, অন্ধবিশ্বাসনির্ভর ও সংস্কারযোগ্য একটি বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই চিন্তাবিদরা অনেকসময় ধর্মীয় অনুশীলনকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হিসেবে তুলে ধরেন। তারা দাবি করেন, ইসলামে সমালোচনা ও পর্যালোচনার জায়গা নেই, এবং এর ফলে গণতান্ত্রিক মতভেদ বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবরুদ্ধ হয়। অথচ তাদের এই বিশ্লেষণ একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিক কাঠামো থেকে আয়রন ক্ল্যাড ধারণা আমদানি করে, অন্যদিকে ইসলামের ভেতরকার ইজতিহাদ, শুরা এবং পরামর্শভিত্তিক নীতিনির্ধারণের ঐতিহাসিক উপাদানগুলো উপেক্ষা করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এই চিন্তাবিদদের হাতে ইসলামি জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ভেঙে পড়ে। আলেম, মুফাসসির বা ঐতিহ্যবাহী ইসলামি পণ্ডিতগণ তাঁদের দৃষ্টিতে 'সেকেলে' হয়ে ওঠেন। ফলে ইসলামি চিন্তার মূল উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ নয় বরং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও দর্শনই মাপকাঠি হয়ে ওঠে। এতে মিশরের সাধারণ জনগণ এক দ্বৈত বাস্তবতায় বসবাস করতে বাধ্য হয়—ধর্মীয় অনুভূতি একদিকে, আর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো অন্যদিকে।

এই দ্বৈততা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামোতে গভীর প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, মিশরের সংবিধান থেকে শুরু করে শিক্ষানীতিতে ইসলামি চেতনার স্থান সংকুচিত হতে থাকে। ইসলামি সংগঠনগুলো যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই মনোভাবের বিরোধিতা করলে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, নির্যাতন, ও জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শেষ ধাপ হয় তখন, যখন পাশ্চাত্য বিশ্ব মিশরের এই চিন্তাবিদদের কণ্ঠস্বরকে "মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী" হিসেবে গ্রহণ করে। পশ্চিমা মিডিয়া ও একাডেমিক জগতে তাহা হুসাইন ও সালামা মুসার বক্তব্য ইসলামি সমাজের আত্মসমালোচনার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যা প্রকারান্তরে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিত্যাগের যৌক্তিকতা তৈরি করে দেয়।

এইভাবে প্রাচ্যবাদী চিন্তার বিস্তার মিশরের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাজনৈতিক কাঠামোতে এক গভীর ছাপ ফেলে যায়। ইসলাম কেবল একটি ব্যক্তিগত ধর্ম হিসেবে সমাজে বিদ্যমান

থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তা ও আইনচর্চায় তার অবদান অগ্রাহ্য হতে থাকে। এই চিন্তাকাঠামো যে কেবল পাশ্চাত্য শক্তির থিংক ট্যাংক দ্বারা রচিত ছিল না, বরং তা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তর থেকেই সংগঠিত ও প্রচারিত হয়েছে—এটাই মিশরের বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক।

■ কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন

মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র ও আধুনিকতার প্রবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। এই আগ্রাসন কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং তা রাষ্ট্র ও সমাজের চিন্তাগত ভিতকে দুর্বল করে দেয়ার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ। এটি চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন একটি কাঠামো তৈরি করে, যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ নিজের ধর্মীয় সূত্র, ঐতিহ্য, ও ইতিহাসকে অবিশ্বস্ত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে শুরু করে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে সরাসরি পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হয়েছে, আবার অনেকক্ষেত্রে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীই একে বাহ্যিক উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার নামে গ্রহণ করেছে।

সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়, অনেক মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্তকরণ ও বিকৃত উপস্থাপন শুরু হয়। পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, আইন, এবং নৈতিকতা চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতবাদকে প্রধান উৎস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে তরুণ প্রজন্ম ইসলামি ইতিহাসকে গৌরবময় নয়, বরং একধরনের পশ্চাদপদতা ও অজ্ঞানতার প্রতীক হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে তিউনিসিয়া, এমনকি বাংলাদেশ বা ইন্দোনেশিয়ার মতো তুলনামূলক ধর্মীয় আবহমানতাপূর্ণ সমাজেও এই ধারা প্রবলভাবে দৃশ্যমান।
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়ে 'জাতীয় পরিচয়' নির্মাণে। বহু মুসলিম রাষ্ট্রেই ইসলামী পরিচয়কে দ্বিতীয় বা গৌণ পর্যায়ে সরিয়ে 'জাতীয়তাবাদ', 'আঞ্চলিকতা', কিংবা 'ভাষানির্ভর রাষ্ট্রচেতনা'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর ফলে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ইসলামি হবে, না কি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মতো ধর্মনিরপেক্ষ? এই দ্বিধা জাতিকে দীর্ঘমেয়াদে আত্মপরিচয়হীন এক গোষ্ঠীতে পরিণত করে। মিশরের জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা, অথবা তুরস্কের কামালিস্ট আন্দোলন—সব ক্ষেত্রেই এই আক্রমণ প্রাসঙ্গিক।

আরেকটি গভীর দিক হলো—ধর্মতাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণের চেষ্টা। কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের মূল ভিত্তি—কুরআন ও সুন্নাহ—কে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বের ধারণা, যেমন বাইবেলের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ বা ঐতিহাসিক-পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা কৌশল প্রয়োগ করেন। এতে কুরআনের সরল ও কালোত্তীর্ণ নির্দেশনাগুলোকে ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতা ও স্থানিকতা দিয়ে সীমিত করে ফেলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, "খিলাফত" বা "হুকুম শরীয়াহ" এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি রাজনৈতিক ধারণাগুলোকে স্রেফ মধ্যযুগীয় কাঠামো বলে ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এই চিন্তাস্রোত প্রায়শই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়। মিডিয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি—এই তিন অঙ্গনকে ব্যবহার করে ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রান্তিক করা হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলোতে ইসলামী চিন্তাবিদদের উপস্থাপন করা হয় 'চরমপন্থী' বা 'অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে, আর পাশ্চাত্যঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের 'উন্নয়নের দূত' রূপে তুলে ধরা হয়। এমনকি ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠনগুলোর চিন্তা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় তৈরি করতে 'উগ্রতা', 'সন্ত্রাস', ও 'বিপ্লবী অপসংস্কৃতি'র লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের আরেকটি কৌশল হলো ইসলামি সমাজে নারীর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ করা। নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের নামে এমন চিন্তাধারা প্রচার করা হয়, যার ফলে নারী তার প্রাকৃতিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক ভূমিকা নিয়ে অপরাধবোধে ভোগে। ইসলাম যেখানে নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সম্মান প্রতিষ্ঠার দিকটি কেন্দ্র করে, সেখানে পাশ্চাত্য মডেল নারীর স্বাধীনতাকে তার 'দেহ' ও 'পছন্দ'-এর সীমায় আটকে দেয়। অনেক মুসলিম দেশে এই ধারণা শিক্ষা ও আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, যা পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে।
সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো—এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এমনভাবে পরিচালিত হয়, যেন মুসলমানেরা নিজেরাই তাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ হয়। একে বলা যায় "অভ্যন্তরীণ শত্রু" তৈরি করা। এসব চিন্তাবিদরাই যখন রাষ্ট্রের উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিনিধি হন, তখন ইসলামি সমাজের চিন্তাগত আত্মরক্ষার শক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের তত্ত্ব ও ভাষা এমনভাবে বিন্যস্ত হয়, যা সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রতিকারমূলক দিক হলো আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন। মুসলিম সমাজকে আবারও কুরআন, সুন্নাহ, এবং সালাফদের চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাদের জ্ঞানচর্চা গড়ে তুলতে হবে। সত্যিকারের মুক্ত চিন্তা মানে পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, বরং নিজের বিশ্বাস ও ইতিহাসকে ভিত্তি করে একটি বিকল্প বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো নির্মাণ করা। অনেক আলেম, গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব এই পুনর্জাগরণের পথে কাজ করছেন, যা এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধৈর্য, জ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তিতে এক অনন্য সংগ্রাম।

■ প্রগতিশীলদের পশ্চাদপসরণ

মুসলিম সমাজে প্রগতিশীলদের একটি শ্রেণি এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশ করে যখন মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশিত। এই শ্রেণির অনেকেই চিন্তায় আলোকিত ও বিদগ্ধ হলেও তারা ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে একধরনের সংকোচ বা দ্বিধাগ্রস্ততা প্রদর্শন করেন। এই শ্রেণির অনেকেই ইসলামী আইন ও খিলাফতের ধারণাকে "পুরোনো" ও "অপ্রয়োগযোগ্য" বলে মনে করেন। তাদের অভিমত ছিল—মুসলমানদের উন্নতি চাইলে পশ্চিমা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

তবে এই শ্রেণি ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, পশ্চিমা আদর্শের সঙ্গে ইসলামি মূল্যবোধের পার্থক্য অতি গভীর ও মৌলিক। বিশেষ করে আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তির 'অভিযান' ও মুসলিম বিশ্বে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতির বাস্তব রূপ উপলব্ধি করার পর, অনেকে পুনর্বিবেচনায় যান। কিন্তু তখন এই শ্রেণির অনেকেই তাদের পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসতে পারেননি; বরং 'ইসলামি গণতন্ত্র', 'মধ্যপন্থা', 'উদার ইসলাম' ইত্যাদি ধারণা দিয়ে মূল সংঘাতকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন।

মিশরের খ্যাতনামা স্কলার **ড. ইউসুফ আল-কারাযাভী** বলেন:
"আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা মানেই যদি ইসলামি বিধানকে অস্বীকার করা হয়, তবে তা কোনো মুসলিমের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"
এই বক্তব্য প্রগতিশীলদের একটি অংশের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তুরস্কের উদাহরণে দেখা যায়, কামাল আতাতুর্কের পরবর্তী যুগে কিছু প্রগতিশীল মুসলিম স্কলার ইসলামি আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের মিল খুঁজে বের করতে চেয়েছেন, কিন্তু তারা

কখনোই খিলাফত, শরিয়া ও ইসলামী সার্বভৌমত্বের দাবিকে সামনে আনতে পারেননি। বরং, তাদের নীরবতা কিংবা দ্বৈত অবস্থান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণকে দুর্বল করে দেয়।

ড. আবুল হাসান আলী নাদভী তাঁর বিখ্যাত রচনায় বলেন:
“যেসব মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণি পশ্চিমের প্রভাবে ইসলামি শাসনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা ইসলামের ক্ষতিই করেছে; উপকার নয়।”

এই পশ্চাদপসরণ কেবল চিন্তার নয়; বরং ইসলামের সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামো থেকে আত্মগোপনের সূচনাবিন্দু। এদের দ্বৈত নীতি ও কৌশলগত আপসের কারণে মুসলিম তরুণদের মধ্যে দ্বিধা, ভ্রান্তি ও আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এ প্রগতিশীলতা একটি 'সেফ ইসলাম' উপস্থাপন করে—যা পরিপূর্ণ ইসলাম নয়, বরং একটি পশ্চিম-সুহৃদ সংস্করণ।

ফলে, ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাতে এই শ্রেণির পশ্চাদপসরণ একধরনের আদর্শিক আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখা যায়। এ শ্রেণির নিরবতা বা অস্পষ্টতা মূলত ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্জাগরণের পথে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আজকের প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীলতার পুনরায় সংজ্ঞায়ন ও আত্মসমালোচনা ছাড়া ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় হবে না।

■ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার ছোবল

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বে শুধু একটি শিক্ষা পদ্ধতি নয়, বরং এটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের হাতিয়ার। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায়, পরিচয়ে, এমনকি তাদের আত্মপরিচিতিতেও এক ধরণের আমূল পরিবর্তন আনা হয়।

উপনিবেশিক শক্তি বিশেষত ব্রিটিশরা উপমহাদেশে যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে, তা কেবল তাদের প্রশাসনিক কাজ সহজ করার জন্য নয়, বরং এক দীর্ঘমেয়াদী আদর্শিক লক্ষ্য পূরণের কৌশল। ১৮৩৫ সালে থমাস ম্যাকলে’র "Minutes on Indian Education" ছিল এর মূল ভিত্তি। সেখানে তিনি বলেন:

“We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern — a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in

morals and in intellect.”

এই নীতির পরিণতি হয় মুসলিম সমাজে এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব—যারা চিন্তায়, আচরণে ও মূল্যবোধে পশ্চিমপন্থী। তারা ধীরে ধীরে ইসলামী জ্ঞান, কালচার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে।

উদাহরণ ও বাস্তবতা:

১. আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম মডার্নিজম:

সৈয়দ আহমদ খান পশ্চিমা শিক্ষাকে মুসলিমদের উন্নতির মূল হিসেবে চিহ্নিত করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই ধারণার প্রতীক। তবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুসলিমদের একটি প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণি তৈরি করে যারা ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি অনুগত ছিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রভাবনার বিরোধিতা করে।

২. মিশর ও আল-আযহার সংস্কার:

ঔপনিবেশিক প্রভাবে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিষয়ের তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনৈতিক তত্ত্বে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে একটি “দ্বৈত মনস্কতা” (split consciousness) তৈরি হয়—একদিকে ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্যদিকে পশ্চিমা মূল্যবোধ।

৩. তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের শিক্ষা সংস্কার:

কামাল আতাতুর্ক আরবি লিপিকে নিষিদ্ধ করে লাতিন লিপি চালু করেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে সেক্যুলার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। ফলত, একটি পুরো প্রজন্ম ইসলামি ঐতিহ্য ও শাসন কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪. ফরাসি শাসনাধীন আলজেরিয়ায় শিক্ষানীতি:

ফরাসিরা আরবি ভাষা ও ইসলামি শিক্ষাকে দমন করে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য চাপিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পরও আলজেরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় ফরাসি আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল।

৫. উপমহাদেশে মুসলিম পরিচয়ের ধ্বংস:

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় ‘সিভিলাইজেশন’, ‘লিবারেলিজম’, ‘ডেমোক্রেসি’ ইত্যাদি ধারণা তুলে ধরা হয় এমনভাবে, যেন ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা বর্বরতা ও পশ্চাদপসরণের প্রতীক। মুসলিম

তরুণদের মধ্যে ইসলামী ইতিহাস, শরিয়াহ, খিলাফত—এসব বিষয়ে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়।

বিশ্লেষণ:
এই শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে গভীর আঘাত ছিল মুসলমানদের **সার্বভৌমত্ব ধারণা** ও **আল্লাহর শাসন** সম্পর্কে সংশয় তৈরি করা। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা জনগণের মতামতকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ড. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী বলেন:
“No colonization of Muslim lands would have succeeded without the colonization of Muslim minds.”

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা কেবল একাডেমিক নয়, বরং একটি ‘বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশ’। এই উপনিবেশের লক্ষ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তাকে ‘অবাস্তব’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের এমন একটি শ্রেণিতে রূপান্তর করা, যারা বিশ্বাস করে—“ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা”। ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাতে এটি ছিল সবচেয়ে কৌশলগত আঘাত, যার ফলে মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজো চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ জনগণের মনন গঠনের মাধ্যমে সমাজে স্থান করে নেয়। পশ্চিমা গণতন্ত্রের বীজ মুসলিম সমাজে রোপণ করা হয় প্রথমত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের চিন্তাধারায় ইসলামী রাষ্ট্রধারণা-কে প্রতিস্থাপন করে এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা-কে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি উপমহাদেশে এমন একটি শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে যা মুসলিম তরুণদের চিন্তাধারায় ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে অচল, পশ্চাৎপদ ও বাস্তবতাবর্জিত হিসেবে প্রতিস্থাপন করে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যে 'সিভিল সার্ভিস'-এ চাকরি পাওয়া যেত, সেখানে কেবলমাত্র সেই শিক্ষায়দীক্ষায় গড়ে ওঠা মুসলমানই এগিয়ে যেতে পারত—যাদের চিন্তা জাহেলি নয়, বরং সেক্যুলার ও উদারনৈতিক।

ড. মুহাম্মদ আসাদ (Muhammad Asad), যিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সংবিধান গঠনে ভূমিকা রাখেন, তাঁর “Islam at the Crossroads” গ্রন্থে লেখেন:
“The West imposed its way of thinking on Muslims, not just through weapons, but through textbooks.”
তিনি দেখিয়েছেন, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে ‘ধর্মীয় শাসনের’ ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বোঝানো হয়, ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা, রাষ্ট্রপরিচালনার নয়।

অতএব, গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার পূর্বশর্ত ছিল এই পশ্চিমা শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন মুসলিম চিন্তাবিদ শ্রেণি—যারা ইসলামি শাসনের ধারণাকে অস্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রগতিশীলতা হিসেবে দেখতে শেখে।

প্রখ্যাত আলজেরিয়ান দার্শনিক মালেক বেননবী বলেন:
“When a colonized mind begins to see itself inferior, the way to domination is already paved.”
এই মনোভাবই ছিল মুসলিম সমাজে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমি। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা যেখানে 'আল্লাহর সার্বভৌমত্বে' প্রতিষ্ঠিত, সেখানে গণতন্ত্রকে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে পূর্বপ্রস্তুতি ছিল পশ্চিমা শিক্ষা ও চিন্তায় ভাসমান মুসলমানদের তৈরি করা।

এখানে সংঘাতটি প্রকট হয়:
- ইসলাম বলে: الحكم لله – শাসন কেবল আল্লাহর।
- গণতন্ত্র বলে: Sovereignty belongs to the people.

এ দুই মূলনীতি কখনোই সমান্তরাল হতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমা শিক্ষায় দীক্ষিত মুসলমানরা এই বিরোধকে প্রশমিত করতে গিয়ে একধরনের “প্রগতিশীল ইসলাম” তৈরি করেন—যেখানে ইসলামের মূলনীতি গোপনে পেছনে ঠেলে দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাময়িক সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষয়ে যায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ পশ্চিমা সভ্যতা অনুসরণের ফল

পশ্চিমা সভ্যতা মূলত ইউরোপীয় অভিজাতদের একটি প্রজেক্ট, যার শেকড় রয়েছে গ্রীক-রোমান দর্শন, খ্রিস্টীয় ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মবিরোধী রেনেসাঁ ও বস্তুবাদী বিপ্লবের ভিতরে। এই সভ্যতা আল্লাহর বিধান এবং ঐশী পথনির্দেশনাকে অগ্রাহ্য করে মানবকে কেন্দ্র করে একটি জীবনব্যবস্থা নির্মাণ করেছে। ইসলামের তুলনায় এটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী। তা সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ—বিশেষত উপনিবেশ পরবর্তী যুগে—এই সভ্যতার নানা উপাদানকে উন্নয়নের প্রতীক বলে মনে করে আত্মীকরণ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, আরব জাতীয়তাবাদ এবং কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক প্রথাগত ইসলামি মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ইউরোপীয় আধুনিকতার কাঠামো গ্রহণ করে। তুরস্কের নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় খিলাফতের বিলুপ্তি, শরিয়াহর বাতিল, আরবি ভাষার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং লাতিন লিপি প্রবর্তন মুসলিম সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার এক নগ্ন ও জোরপূর্বক আরোপের দৃষ্টান্ত। একইভাবে মিশরে তানতাভি, আব্দুহু বা আলী আব্দার রাজিকের মতো স্কলাররা ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে প্রান্তিক করে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রূপ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোতে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করে, যার ফলে জ্ঞান ও চিন্তার ধারা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক না থেকে হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য মনীষার অনুবাদ। ব্রিটিশ ভারতে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ধর্মহীন পশ্চিমা শিক্ষা চালু করেন, যার ফলে একটি নতুন শ্রেণির মুসলিম জন্ম নেয়, যারা পশ্চিমা মূল্যবোধে প্রশিক্ষিত, অথচ আত্মপরিচয়বিহীন। এই শ্রেণিটি পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের ‘প্রগতিশীল’ ও ‘আধুনিকতাবাদী’ বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যারা ইসলামি আদর্শে রাষ্ট্র বা সমাজ গঠনের চিন্তাকে পশ্চাদপদতা বলে মনে করত।

পশ্চিমা সভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘মানবমুক্তির’ নামে ধর্ম ও নৈতিকতার সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে ফেলা। এই ভাবধারার অনুকরণে মুসলিম দেশগুলোতেও ফেমিনিজম, সমকামিতার স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে সীমাহীন মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদের একাংশ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ‘উন্নয়নশীল’ সমাজের চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন করেছে, ফলে ইসলামি আইন, পর্দা, ইসলামী অর্থনীতি, হিজাব, কুরআনী দণ্ডবিধি—এসবকে পশ্চাদপদ ও নিষ্ঠুর হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে বিভাজন, স্বকীয়তা হারানো, আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা ও পশ্চিমনির্ভরতা দেখা যায়, তার একটি বড় উৎসই হলো এই পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুসরণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা ডব্লিউটিও-র মত পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের শর্তাধীন সাহায্য গ্রহণ করে মুসলিম দেশগুলো তাদের স্বকীয় অর্থনৈতিক দর্শন বিসর্জন দিয়েছে। একইভাবে রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার নামে পশ্চিমা শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা ইসলামি খিলাফত বা শুরাব্যবস্থাকে 'অপ্রাসঙ্গিক' মনে করতে শুরু করেছে।

অনেক ইসলামি স্কলার, বিশেষত বিংশ শতকের শুরুতে, এই অনুকরণকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে সমর্থন করেছেন। তারা ইসলামের মূলনীতি ও হুকুমকে পশ্চিমা আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। আবদুল রাজিক তাঁর 'الإسلام وأصول الحكم' বইয়ে দাবি করেন, ইসলাম খিলাফতের পক্ষে নয়, বরং একটি ধর্মীয় বিশ্বাসমাত্র, যার সাথে রাষ্ট্রচালনার সম্পর্ক নেই। এই ধরনের চিন্তাধারা আজও বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর চিন্তার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে।

ফলস্বরূপ, মুসলিম বিশ্ব আজ একটি সাংস্কৃতিক দ্বিধা, রাজনৈতিক ভিন্নতা এবং চিন্তাগত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তারা নাকি মুসলিম, কিন্তু জীবনব্যবস্থায় মুসলিম নয়। তারা কাবা ও মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণে নারাজ। এই দ্বিচারিতা ইসলামি সভ্যতার পুনর্জাগরণে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় - মুসলিম দেশে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব

■ বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা

স্বকীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং পৃথিবীতে এই উম্মাহর অবস্থান ও মর্যাদা সুরক্ষা এর পয়গম ও দাওয়াত কি তা উপলব্ধি করা, পরকাল ও জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলির উপর বারবার তাগিদ দেওয়া____ এমন পার্থক্য সূচক সীমারেখায় (Lines of demarcation) দুটি সভ্যতা কে একে অপর থেকে আলাদা করে দেয়। একটি হল সেই সভ্যতা, যার উৎস ইসলাম এবং যার দায় সে স্বীকার করে। যাতে ইসলামী ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রতিফলন ও আত্মবোধ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সভ্যতা, যাকে ইসলাম অস্বীকৃতি জানাই এবং যাতে মুসলমানদের ক্ষতিই ক্ষতি। তদুপরি যাতে মানসিক দাসত্ব ও পরাজয়ের চিহ্ন প্রকট। এবং বানরের মতো অনুকৃতি করার (Aping)ঝোঁক এবং তো তার মত সোনা কথার আবৃত্তি করার প্রবণতা স্পষ্ট।

সভ্যতার কাঠামো নির্মাণ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন হলো মানবীয় মেধা, জাতির প্রতিভা (Genius),ইচ্ছা শক্তি ও সাহসিকতা এবং ধর্মের সঠিক উপলব্ধির পরীক্ষা। এটি অনুকৃতি, সমালোচনা বা সংযোজন ও পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া নয়। ইসলাম হারাম ও হালাল এর সীমা নির্ধারণ করেছে। এই সীমা অতিক্রম করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে শুদ্ধ ও সঠিকভাবে জীবন উপভোগের বিস্তৃত অবকাশ রয়েছে, শর্ত হলো যে এতে কোন অতিরঞ্জন ও সংকোচন থাকবে না। অন্যের অধিকার লঙ্ঘন হবে না। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। অর্থাৎ জীবন ধারা এমন হবে না, যা মানবীয় গুণাবলী ও মহত্ত্বের পরিপন্থী। এই চেতনা পোশাক, খাদ্য, গৃহ ও বাড়ির পরিবেশ এবং জীবন উপভোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত। এটি জনকল্যাণের সুরক্ষা, অনিষ্ঠ ও ক্ষতি থেকে সতর্কতা, যথাসম্ভব বস্তুগত এবং প্রতিরক্ষামূলক শক্তির অর্জন এবং দরকারি ও উপকারী বিজ্ঞানের ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। এই শর্তে যে, তা তার ব্যক্তিত্বের বুনিয়াদ দুর্বল এবং ইসলামী জাতীয়তা ক্ষুন্ন করবে না। সেই সাথে জাতির মধ্যে হীনমান্যতা, আস্থা হীনতা, নির্বোধ এবং আবেগময় উপায়ে অন্যের অন্ধ অনুকরণ, অন্যের রঙে মলিন হওয়া এবং সম্মানের চোখে অন্যের জীবনযাত্রার দিকে তাকানোর মনোভাব সৃষ্টি হবে না। এটিই এই সভ্যতার ভিত্তি, যাতে এক দিকে রয়েছে ইস্পাতের কঠোরতা এবং অন্যদিকে রেশমের কোমলতা। এই সভ্যতা বাস্তবতা, নতুন সমস্যা এবং সময় এর নতুন দাবি মোকাবেলায় রেশমের মতো কোমলতা ধারণ করে। পক্ষান্তরে আকিদা-বিশ্বাস এবং আখলাক-নৈতিকতার সীমানায় ইস্পাতের চেয়েও শক্ত এবং পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়। এটি বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের বিবেক ও আকলের দৃষ্টি সদা উন্মুক্ত ও উদার রাখে।

এবং সেসব প্রকল্প গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে যেগুলি দ্বীনের কোন ক্ষতি করে না, পরিবর্তন ঘটায় না তার নৈতিক ব্যবস্থায় ।

■ উম্মাহর অবস্থান ও দাওয়াহ

ইসলামী উম্মাহ সর্বশেষ দ্বীনি পয়গমের ধারক তার সমস্ত কর্ম ও আন্দোলনের ওপর প্রভাব সম্পাদনকারী। পৃথিবীতে তার অবস্থান হলো নেতৃত্ব ও নির্দেশনার এবং পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার অবস্থান। আল কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে অস্পষ্টতার সাথে যা ঘোষণা করেছেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক।(সূরা আলে-ইমরান:১১০)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ

আর ঠিক এইভাবে আমি তোমাদের মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি রাতে তোমরা বিশ্ববাসীর উপর সাক্ষী হতে পারো। (সূরা বাক্বারা:১৪৩)

কাজেই এই উম্মতের স্থান কাফেলার পেছনে হবে এবং শীষ্য ও অনুচরদের কাতারে থাকবে এবং অন্য জাতির সমর্থন ও আশ্রয়ে তারা টিকে থাকবে এবং নেতৃত্ব ও হেদায়েত, আদেশ ও নিষেধ এবং মানসিক ও বুদ্ধি বৃদ্ধির স্বাধীনতার পরিবর্তে তারা নকল ও অনুকরণ, আনুগত্য ও বশ্যতা নিয়ে তুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকবে _____প্রশ্নই আসেনা।
তার সঠিক অবস্থানের তুলনা দেওয়া যেতে পারে সেই মহৎ, দৃঢ় ইচ্ছা সম্পন্ন, মুক্ত বিবেকবান ব্যক্তির সাথে। যিনি প্রয়োজনের সময় স্বীয় ইচ্ছা ও কর্তৃত্বে অন্যের কাছ থেকে সেসব জিনিস গ্রহণ করেন যা তার অবস্থার অনুকূলে হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করে না। এবং সেসব বিষয় প্রত্যাখ্যান করেন, যা তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখেনা বা তাকে বিপর্যস্ত করে। এই কারণেই এই জাতিকে অন্য জাতির রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করা থেকে বারণ করা হয়েছে।
এই জাতির জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, রয়েছে বিশ্বের জন্য পরিপূর্ণ দাওয়াহ।তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সংগ্রাম ও সাধনা এবং সকল প্রকার সক্রিয়তা সবই তার

বিশ্বাস, লক্ষ্য এবং পয়গামের অধীনে। তার কাছে জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, শক্তির জন্য শক্তি এবং ঐক্যের জন্য ঐক্যের কোন মূল্য নেই। মানুষ এবং মহাবিশ্বের উপর জয়লাভ এবং বস্তু ও মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ (যদি তা নিছক নিজের ক্ষমতা বা বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব জাহির করার জন্য হয়) তার কাছে প্রবৃত্তিপূজা বা সীমাতিক্রমী অহমপ্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। আল কুরআন তার সমস্ত আবেগ ও প্রবণতা এই আয়াতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

এই পরজগৎ বিশেষভাবে সেসব লোকের জন্য সংরক্ষিত, যারা এই দুনিয়ায় উদ্ধত ভাব দেখাতে চায় না এবং ফ্যাসাদ করে না। আর শুভ পরিণতি মুত্তাকিদের জন্য। (সূরা ক্বসাস:৮৩)

ইসলাম প্রয়োজনের তাগিদে এবং মানবতার কল্যাণে এবং ভালো উদ্দেশ্যে জীবন মহাবিশ্ব ও জ্ঞানের পথে সংগ্রাম করাকে অবৈধ ঘোষণা করে না। বরং কখনো কখনো একে উৎসাহিত করে। এর জন্য মহান আল্লাহ একজন শক্তিশালী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান,সৎ ও সংস্কারশীল ঈমানদারের উদাহরণ দিয়েছেন। যিনি মহাজাগতিক ও বৈষয়িক শক্তিকেও বশীভূত করেন এবং সম্পদ ও উপকরণ ও সংগ্রহ করেন এবং আপন বিজয় ও অভিযানের পরিধিও বিস্তৃত করতে থাকেন। কিন্তু ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের উত্থান কালেও,বাহ্যিক কারণগুলিতে হস্তক্ষেপ করার পরেও তিনি আপন রবের প্রতি ঈমান রাখেন। তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আখেরাতে বিশ্বাস রাখেন এবং তার জন্য চেষ্টা করেন। নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেন। তিনি হন মানবতা ও দুর্বল জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সত্যের সমর্থক এবং তার সমস্ত শক্তি, সাধনা, সামর্থ্য এবং তার সমস্ত সম্পদ ও সংগ্রহ আল্লাহর নামের উন্নতি ও মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করার জন্য ব্যয় করেন। যে চরিত্র ও ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুলাইমান ইবনে দাউদ, জুলকারনাইন এবং নিজ নিজ সময়ে ইসলামের খলিফা ও ইমামগণ।

এই জীবন সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও অবস্থান হল ইসলাম একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং উন্নতি ও সাফল্যের সোপান বিবেচনা করে না। ইসলাম এটিকে একটি ক্রান্তিকালিন পর্যায়ে হিসেবে বিবেচনা করে। যার অতিক্রমণ মানুষের জন্য অপরিহার্য। তার কাছে এই জগৎ বৃহত্তর সাফল্য, অমর এবং আনন্দময় জীবনের বাহন মাত্র। পবিত্র কুরআন জগতের অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের তুলনায় এর অসারতা তুলে ধরে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে বলেছে :

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

(মনে রাখবে) পার্থিব জীবনের ভোগ পরকালের তুলনায় নিতান্তই কিছু নয়। (সূরা তাওবা :৩৮)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।(সূরা আনকাবুত :৬৪)

আরেক জায়গায় এসেছেন :

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।(সূরা হাদিদ: ২০)

ইসলাম খুবই স্পষ্ট ভাবে দুনিয়াকে আখেরাতে সেতু এবং কর্মের সুযোগ হিসেবে বর্ণনা করে। বলে :

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَي الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।(সূরা কাহাফ: ৭)

অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায় উপকরণ থেকে মুসলিম এমন ভাবে উপকৃত হয় এসব জিনিস তার জন্য বশীভূত করা হয়েছে। বরং তারই জন্য অস্তিত্বশীল করা হয়েছে। আর পরকালের জন্য সে এমন ভাবে চেষ্টা করে যেন তাকে তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সে দুনিয়া ও এর উপায় উপকরণকে বাহন মনে করে, আরোহী নয়। দাস ও অধীনস্ত মনে করে, প্রভু ও মনিব নয়। উপায় ওসিলা মনে করে, উদ্দেশ্য ও পরিণতি নয়। সে পরকালকে তার যাত্রার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য মনে করে যেখানে তাকে পৌঁছাতে হবে। তাই এর জন্য তার সমস্ত শক্তি জোগাড় করে, সমস্ত ধরনের ঝামেলা মাথা পেতে নেয়। কষ্ট ভোগ করেন, সংকল্প এবং উৎসাহের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এটি সেই নববী উদাহরণ, যা আল্লাহর রাসূল (সা:) ও দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন :

“আমার সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক শুধু এই যে, আমার উদাহরণ হল সেই সওয়ারির মতো যে গাছের ছায়া নিতে কিছুক্ষণ বসে ছিল ;অতঃপর তাঁত ছেড়ে চলে গেল। (মুসনাদে আহমদ এবং তিরমিজি)

■ ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শূন্যতা

এই সময়ে ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় শূন্যতা হলো এমন একজন নেতা এবং সাহসী ব্যক্তির অভাব যিনি নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোকাবেলা করতে পারেন এবং এই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন কাঠামো তা ধারা এবং একটি নতুন পথ তৈরি করতে পারেন। এমন একটি পথ যেখানে তিনি নকল, অনুকরণ, অতিরঞ্জন ও চরমপন্থার ঊর্ধ্বে অবস্থান করবেন এবং বাহ্যিক রূপ এবং উপরীয় দৃশ্যের ঊর্ধ্বে থাকবেন। বাস্তবতা ও উপায়, শক্তি ও মস্তিষ্কের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। বাহ্যিক হলো সে বিভ্রান্ত হবেন না।
তিনি হবেন এমন একজন কামিল মানুষ এবং প্রতিভা (Genius) যিনি তার দেশ এবং তার জনগণের জন্য একটি নতুন রাজপথ উন্মুক্ত করবেন। যেখানে একদিকে রয়েছে নবুওয়াতের আশীষ প্রাপ্ত ঈমান এবং সেই দিন যা আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা:)মারফত এই উম্মাহকে দিয়েছেন। অন্যদিকে রয়েছে সেই জ্ঞান, যা কোন বিশেষ দেশ বা জাতি বা যুগের সাথে নির্দিষ্ট নয় ___যিনি দিন থেকে সেই শুভ সংকল্প ও বোধ অর্জন করবেন যা মানবতার সেবা ও সভ্যতার সৃষ্টি ও বিনির্মাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি হবে। যিনি সঠিক ও সুস্থ লক্ষ্য অর্জন করবেন যা কেবলমাত্র ঐশ্বরিক দিন এবং সঠিক ধর্মীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।
তিনি হবেন সেই মহান অন্যতম মস্তিষ্কবান সাহসী ব্যক্তি, যিনি পোস্টটি এবার সভ্যতা এবং এর সমস্ত ধারণা উদঘাটন এবং শক্তির সাথে কাঁচামালের মত আচরণ করবেন এবং তা থেকে একটি নতুন এবং শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে তুলবেন। যা একদিকে ঈমান,নৈতিকতা,তাকওয়া,সহানুভূতি এবং ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত ;অন্যদিকে এর বিশেষ বুদ্ধিমত্তায় উদ্ভাসিত হবে উদ্ভাবনের শক্তি এবং চিন্তার অভিনবত্ব। তিনি পশ্চিমা সভ্যতাকে তার নিজের দেখা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন না যে এটি পূর্ণতা ও বিকাশের শেষ পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং প্রান্ত সিলমোহর লেগে গেছে। এতে পরিবর্তন ও সংযোজনের কোন অবকাশ নেই এবং যেভাবে আছে সেভাবে সব দোষ- দুর্বলতা সমেত মেনে নেওয়ার বিকল্প নেই ;বরং তার জন্য উচিত হলো এর প্রতিটি উপাদানে তিনি আলাদাভাবে নজর দেবেন। যা ইচ্ছে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং ইচ্ছে গ্রহণ করবেন এবং তা থেকে জীবনের একটি কাঠামো প্রস্তুত করবেন যা তার লক্ষ্য তার বিশ্বাস তার মূলনীতি এবং আখলাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইসলাম তাকে জীবনের যে বিধান দুনিয়ার ব্যাপারে যে সুনির্দিষ্ট

দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির সাথে আচরণের যে বিশেষ নিয়ম নীতি এবং আখেরাতের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম ও জিহাদের যে চেতনা প্রদান করেছে, এর উপর ভিত্তি করে এটা হতে হবে এবং তা থেকে সেই জীবন অস্তিত্ব লাভ করবে। যার সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছে : "যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী এবং যদি সে মুমিন হয় তাহলে আমরা তার জীবন দুনিয়াতে সুন্দর করে তুলবো এবং পরকালেও তাকে তার উত্তম কর্মের বিনিময়ে পুরস্কৃত করবো "

সেই মহান মস্তিষ্কের অধিকারী ও সাহসী ব্যক্তি পশ্চিম থেকে এমন সব বিজ্ঞান অর্জন করবেন যা এই জাতি ও দেশের জন্য প্রয়োজনীয়, যার ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে এবং যার ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন প্রভাব নেই। অন্ধকার যুগে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময়কালে (যখন ইউরোপ তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং শান্ত চিত্তে ধর্মীয় বাস্তবতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার মত উপযুক্ত ছিল না) যেসব ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধারণার উপর যে ধুলো রাশি ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলি ঝেড়ে ফেলবেন এবং সেভাবে শুদ্ধ করে তুলবেন যেভাবে কাদামাটির স্তুপ থেকে হীরা বা মণিমুক্তা উত্তোলন করা হয়। তিনি নাস্তিকতা, ধর্ম বিমুখতা এবং আরোপিত 'ভুল সিদ্ধান্ত 'থেকে দরকারি বিজ্ঞান সমূহ মুক্ত করবেন। তিনি পাশ্চাত্য থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞান ও ধারণার মধ্যে বিশ্বাসের আত্মা ফুঁকে দিবেন এবং দ্বীনের গভীর রঙে সজ্জিত করে তাকে নিজের করে নেবেন এবং তা থেকে মহান এবং বৈপ্লবিক উপসংহার হাজির করবেন। যা হবে মানবজাতির জন্য অধিকতর উপকারী এবং পশ্চিমা পণ্ডিতদের আহরিত ফলাফলের চেয়েও যা অধিকতর মূল্যবান সাব্যস্ত হবে।

তিনি হবেন সেই ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্যকে নিজের ইমাম এবং নিজেকে তার অনুরাগী শীর্ষ ও উচ্ছিষ্টভোগী হিসেবে স্বীকার করবেন না। বরং তিনি এর একজন সহযাত্রী এবং সমসাময়িক। যা বিশেষ পরিস্থিতি হেতু কিছু বস্তুগত ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান নিয়ে তাকে সাময়িকভাবে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি এর এসব অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করবেন। তবে নবুওয়াত তাকে যে আলো দিয়েছে তা এতে যোগ করবেন এবং এভাবে ভাববেন যে তাকে যদি পশ্চিম থেকে অনেক কিছু শেখা আবশ্যক হয় তবে পশ্চিমকে ও তার থেকে অনেক কিছু শিখে নেওয়ার আছে। কিন্তু পশ্চিম কে তিনি যা দিতে পারেন তা পশ্চিম থেকে পারেন তার চেয়ে বহু গুণ উত্তম ও উৎকৃষ্ট হবে। তিনি চেষ্টা করবেন আপন বুদ্ধিমত্তা,প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তির সুষম সংমিশ্রনে এমন একটি রাজপথ এবং একটি জীবনাদর্শ তৈরি করতে, যার মূল্যায়ন ও অনুকরণ করতে এমনকি পশ্চিমা বাধ্য হবে। এবং চিন্তা ধারা ও সভ্যতার সভ্যতার পিঠস্থান গুলিতে এমন আরেকটির বৃদ্ধি

ঘটাবেন যা বিশ্বের সেরা সব চিন্তাবিদকে মনন ও অধ্যয়নের এবং মহান জাতিগুলিকে অনুশীলনের আমন্ত্রণ জানাবে।

এই হল ইসলামী বিশ্ব বা কোন ইসলামী দেশের সেই মহান নেতার আদর্শ রূপ, ইসলামী বিশ্বে এখনো যা বিরল যা এক মোহনীয় স্বপ্ন ও কল্পনা হয়ে আছে। তিনি হবেন সেই উচ্চ মর্যাদার রব্বানী সত্তা, যার পাশে যদি ইসলামী দুনিয়ার এই দ্বীনহীন অনুকরণকারী ও অনুগত নেতাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের নেহাত তুচ্ছ মানুষ হিসেবে দেখাবে এবং চিন্তা চেতনা, দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার দিক থেকে pygmies (হ্রস্বকায় যেকোনো প্রাণী)পরিদৃষ্ট হবে।

এই অর্ধশতাব্দীতে প্রাচ্যের যত নেতা আবির্ভূত হয়েছে, তাদের কেউই এই উচ্চমান পূরণ করতে পারেননি এবং কেউ সেই জরুরত পূরণ করছে না। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

■ পুজিবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক মতবাদ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যা মূলত সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বাজারনির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থা ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও শিল্পবিপ্লবের পরিক্রমায় বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে গঠিত হওয়ায় এতে নৈতিকতা, আখিরাতবোধ বা দায়িত্বশীলতা নেই; বরং এতে সর্বোচ্চ লাভ অর্জনই মূল লক্ষ্য, যা সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য, সম্পদের অসাম্য এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে এ ধরণের এককেন্দ্রিক লাভভিত্তিক ও নির্লজ্জ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির বিরোধী। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একদিকে যেমন শারঈ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত, তেমনি এটি ন্যায়ের ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। পুঁজিবাদ যেখানে সূদ (interest), মুনাফাখোরি (monopoly), রিবা, এবং গরীব শ্রেণিকে শোষণের মাধ্যমে ধনসম্পদকে সীমিত গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত করে রাখে, ইসলাম সেখানে সম্পদের প্রবাহ সকল শ্রেণির মধ্যে সমভাবে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

" كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ "

অর্থাৎ, যেন সম্পদ ধনী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে (সূরা হাশর: ৭)।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির অধিকারকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করা হয়। এর ফলে সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ ও বস্তুবাদের প্রাধান্য বাড়ে। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি আত্মসংযম, যাকাত, সদকা, কিফালা (জামিনদারি), কারযে হাসানা (বিনাসুদের ঋণ) এবং সম্পদের উপর আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

" من لا يَرحم الناس لا يرحمه الله ",

অর্থাৎ যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না (বুখারী, মুসলিম)।

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদ মুসলিম বিশ্বে ঢুকে পড়েছে কর্পোরেট স্বার্থ, বিদেশি বিনিয়োগ ও ঋণনির্ভর উন্নয়নের নামে। এর ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই নিজস্ব অর্থনৈতিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসমূহ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিংবা ডাবলু. টি. ও.-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর করাল গ্রাসে পড়ে, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ইসলামি অর্থনীতির পূর্ণ বাস্তবায়নে অপারগ হয়ে পড়ে।

ইসলামী অর্থনীতি যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের উপর আরোপ করে, পুঁজিবাদ সেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়। ইসলাম ব্যর্থ ব্যক্তিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই নয় বরং সমাজ-রাষ্ট্রকেও ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করে। নবিজি (সা.) এর যুগে মসজিদে একজন অভাবী সাহাবিকে দেখে তাঁকে কাজের ব্যবস্থা করে দেন, তেমনি সমাজের বাকি সদস্যদেরকেও তার জন্য দায়িত্বশীল মনে করেন। এটি একটি নৈতিক-আধ্যাত্মিক অর্থনীতির দৃষ্টান্ত যা পুঁজিবাদ একেবারে অস্বীকার করে।

অতএব, ইসলামী সভ্যতার গঠনে ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি ভিত্তি রচনা করে, যেখানে পুঁজিবাদের মত বস্তুবাদী ও শোষণমূলক ধারা পরিত্যক্ত হয়। বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যদি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিকে ইসলামী কাঠামোর আলোকে পুনর্গঠন করতে পারে, তাহলে পশ্চিমা পুঁজিবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত থেকে একটি ন্যায্য ও আত্মিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কেবল একটি বিকল্প নয় বরং এটি সভ্যতা নির্মাণের একটি বাধ্যতামূলক মৌলিক স্তম্ভ।

■ বায়তুল মাল ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো বায়তুল মাল। এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক তহবিল নয়, বরং একটি রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, যার মাধ্যমে ইসলাম সম্পদের

যথাযথ বণ্টন, দরিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায়ের বাস্তবায়ন করে থাকে। বায়তুল মাল হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও খিলাফতে রাশেদার যুগে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হয়েছেন—গরীব, এতিম, বিধবা থেকে শুরু করে অসহায় এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত।

পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে অর্থনীতিকে ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়, সেখানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বায়তুল মাল পরিচালিত হয়েছিল নিখুঁত পরিকল্পনা ও দায়বদ্ধতার সাথে। দরিদ্র, অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে ভাতা প্রদান, যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসা, সরকারি কর্মচারীদের বেতন, এতিম-উপসেবন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে বায়তুল মাল ব্যয় হতো।

বায়তুল মাল আয় সংগ্রহ করত বিভিন্ন উৎস থেকে—যেমন যাকাত, খরাজ (কৃষি কর), উশর (ফসলের এক-দশমাংশ), জিজিয়া (অমুসলিম নাগরিক কর), ফাই (অর্থাৎ যুদ্ধবিহীনভাবে প্রাপ্ত সম্পদ), গনীমা (যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ), খুমুস (পঞ্চমাংশ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ), ওয়াকফ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের লাভ। এই উপার্জন শুধুমাত্র শাসকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টনযোগ্য ছিল। কুরআনে বলা হয়েছে, "إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ..." (সূরা তাওবা: ৬০)। অর্থাৎ যাকাতের টাকা কাদের মধ্যে বণ্টন হবে তার স্পষ্ট নির্ধারণ আল্লাহ করেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রে 'ট্রেজারি' বা 'সেন্ট্রাল ব্যাংক' থাকলেও তা এক purely অর্থনৈতিক কেন্দ্র; সেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণ বা নৈতিক দায়িত্ব পালন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যদিকে বায়তুল মাল এমন একটি কেন্দ্র, যেখানে অর্থনীতির প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইসলামী মূল্যবোধ ও আখিরাতের জবাবদিহিতার বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ (রহ.) এর সময়ে বায়তুল মাল এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছিল যে, যাকাত বিতরণের জন্য কোনো গরীব মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বায়তুল মাল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বণ্টনের মাধ্যম নয় বরং এটি একটি সভ্যতা গঠনের মূল চালিকাশক্তি। এটি জনগণের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং 'হাক্কুল ইবাদ' (মানবাধিকারের) বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি

একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, কারণ ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী সভ্যতা গড়ে ওঠে।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যদি বায়তুল মাল ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা বাহ্যিক সাহায্যনির্ভরতা, ব্যাংক ঋণের সুদের বোঝা এবং কর্পোরেট দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত "ওয়েলফেয়ার স্টেট"-এর ধারণা মূলত ইসলামের বায়তুল মাল ব্যবস্থা থেকেই অনুপ্রাণিত, যদিও তা থেকে নৈতিকতা, তাকওয়া এবং আখিরাতের ধারণাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সুতরাং, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বায়তুল মাল ভিত্তিক একটি সুসংগঠিত, স্বচ্ছ ও আল্লাহভীতি সম্পন্ন অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটি শুধু একটি বিকল্প নয় বরং একটি দায়িত্ব, একটি ইবাদত এবং একটি চিরন্তন দৃষ্টান্ত যা রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর খেলাফতের যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায় - কিছু অনুসন্ধান

■ শুরাহ ও পার্লামেন্ট কি একই?

মানবজাতির ইতিহাসে পরামর্শ একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু প্রশ্ন হল—ইসলামের "শূরার" ব্যবস্থা এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার "পার্লামেন্ট" কি আদতে এক জিনিস? উভয়েই কি জনগণের অংশগ্রহণ, মতামত ও প্রতিনিধি ব্যবস্থার প্রকাশ? নাকি এই দুটি ব্যবস্থা মূলত দর্শনগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন?

শূরা হলো ইসলামের একটি মৌলিক ও ঈমানি স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন সকল বিষয়ে।"(সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯)

এখানে পরামর্শের নির্দেশ রাসূল (সা:) কে দেওয়া হয়েছে, অথচ তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতো! কেন? উম্মাহর মাঝে পরামর্শের গুরুত্ব ও শাশ্বততা প্রতিস্থাপন করতেই।কুরআন এ এসেছে,

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"আর তাদের সমস্ত কার্য পরস্পরের পরামর্শে নির্ধারিত হয়।"(সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৮)

ইমাম ইবন কাসীর রহ. বলেন, "এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীয় নয়, বরং উম্মাহভিত্তিক পরামর্শই গ্রহণযোগ্য।" (তাফসীর ইবনে কাসীর)

শূরার মূল বৈশিষ্ট্য

1. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি: শূরায় চূড়ান্ত কর্তৃত্ব মানুষের নয়, আল্লাহর হুকুমের অনুগত।
2. শূরার মূল ভিত্তি—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।
3. তাকওয়াভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন: প্রতিনিধি নির্বাচনে ধর্মীয় জ্ঞান, ন্যায়ের চেতনা ও আমানতের যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়।
4. একক নেতৃত্বের অধীনে পরামর্শ: চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শূরা গ্রহণের পরও নেতৃত্বই নেয়—যেমন রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে ছিল।

পার্লামেন্টের দর্শন ও কার্যপ্রণালী

পার্লামেন্ট আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এর কিছু মুখ্য বৈশিষ্ট্য:

1. জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty): এখানে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জনগণের, তারা যে আইন চায়, সেটিই প্রণয়নযোগ্য—even if it contradicts Divine Law.
2. আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা: পার্লামেন্ট নিজেই আইন তৈরি করে—এটা শরিয়াহর সম্পূর্ণ বিপরীত।যেমন—সমলিঙ্গ বিয়ে, সুদ বৈধতা, নারীবাদী নীতিমালা ইত্যাদি পাশ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে।

3. দলভিত্তিক সিদ্ধান্ত: অধিকাংশ সময় সিদ্ধান্ত দলীয় ও স্বার্থকেন্দ্রিক, নৈতিকতা ও শরিয়াহ ভিত্তিক নয়।

4. লবিং ও ভোট রাজনীতি: আইনের মুল্যায়ন নয়, কে কত শক্তিশালী—তা-ই নির্ধারণ করে কে জয়ী হবে।

শূরা ও পার্লামেন্টের মৌলিক পার্থক্য

বিষয়	ইসলামিক শূরা	পার্লামেন্ট
সার্বভৌমত্ব	আল্লাহর	জনগণের
সিদ্ধান্তের উৎস	কুরআন- সুন্নাহ	মানুষের মত
প্রতিনিধি নির্বাচন	তাকওয়া ও জ্ঞান	ভোট ও জনপ্রিয়তা
চূড়ান্ত কর্তৃত্ব	আমির বা খলিফা	সংখ্যাগরিষ্ঠ দল
হালাল হারামের মানদন্ড	শরিয়াহ সম্মত	মানব মত

ইমাম আল-মাওয়ার্দী (আহকামুস সুলতানিয়া) বলেন: "শূরা এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সিদ্ধান্ত শরীয়াহর আলোকে আমীর গ্রহণ করবেন, এবং শরীয়াহর সীমার বাইরে কোনো মত আমলে নেওয়া হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে শূরার বাস্তব রূপ দেখা যায়:

√বদর যুদ্ধের আগে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ।

√উহুদের যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণে যুবকদের মত মেনে নেওয়া।

√হুদায়বিয়ার সন্ধি নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ, তবুও আল্লাহর নির্দেশ মেনে সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট:

✗মিসরে পার্লামেন্ট আইন পাশ করেছে ইসলামি দল নিষিদ্ধ করার।

✗তিউনিসিয়ার পার্লামেন্ট শরিয়াহবিরোধী আইন এনেছে নারী স্বাধীনতার নামে।

✗পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সুদবিরোধী আইন বাতিল করেছে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে।

শায়খ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন:

"গণতন্ত্র ও ইসলামের মূল পার্থক্য এই যে, গণতন্ত্রে হালাল-হারামের সীমা মানুষ নির্ধারণ করে, কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে আল্লাহর সীমার বাইরে একচুলও ছাড় দেয় না।"(সূত্র: "ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা")
ড. ইউসুফ আল কারজাভি বলেন: "শূরা হচ্ছে ঈমানের অনুষঙ্গ, পক্ষান্তরে পার্লামেন্ট এক বিশ্বদর্শন—যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকেই হাকিম বানায়।"(সূত্র: فقه الدولة في الإسلام)
আমাদের সত্য ও ভ্রান্তির ফারাক বুঝা জরুরি। "শূরা" ও "পার্লামেন্ট"—দুইটি শব্দ দেখতে কাছাকাছি হলেও দর্শন, উৎস, লক্ষ্য ও বিধিব্যবস্থায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আর অন্যটিতে মানুষের সার্বভৌমত্ব। একটিতে শরিয়াহ নির্ভরতা, অন্যটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের খেয়াল।
এটি শুধু তাত্ত্বিক নয়, উম্মাহর ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী একটি চেতনার দ্বন্দ্ব। মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব—শূরার দর্শনকে বুঝা, লালন করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের ভিত রচনায় এগিয়ে আসা।
"যে শাসনব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে মানুষের মতই চূড়ান্ত, তা কখনোই ইসলামি হতে পারে না।"—ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ

■ ইসলাম ও গনতন্ত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

মানব সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বহু জাতি-গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেছে, যেখানে জনগণের মতামত ও ভোটাধিকার সর্বোচ্চ মর্যাদায় গৃহীত হয়। অপরদিকে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যার রাজনৈতিক দর্শন আল্লাহর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রশ্ন হলো: ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোথায়? এ আলোচনা তত্ত্ব, ইতিহাস, আইন ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে হবে।

১. সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন: আল্লাহর নাকি জনগণের?

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো "জনগণের সার্বভৌমত্ব" (Popular Sovereignty)। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণ ইচ্ছামতো প্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে, এবং আইন প্রণয়ন বা বাতিল করে। এটি আধুনিক গণতন্ত্রের মুখ্য স্তম্ভ। যেমন:
"The government derives its just powers from the consent of the governed." (John Locke)

অপরপক্ষে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর ইরশাদ:
ِإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
"শাসন শুধুমাত্র আল্লাহরই।" (সূরা ইয়ুসুফ ১২:৪০)

অর্থাৎ, মানুষের কোনো সংস্থা বা ব্যাক্তি আল্লাহর বিধির বাইরে শাসন করার অধিকার রাখে না।

শায়খ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"ইসলাম হলো সেই ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর হুকুমই সর্বোচ্চ এবং সর্বাগ্রে।" (সিরাতুন নবী, ইবনে কাসীর)

২. আইন প্রণয়ন: মানুষ নাকি আল্লাহ?

গণতন্ত্রে আইন প্রণয়ন হয় মানুষের ভোট ও মতামতের ভিত্তিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়। এর ফলে অনেক সময় আইনগুলো মৌলিক নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধি ও মানবিক মর্যাদা বিরোধী হয়।

তুলনায়, ইসলামে আইন (শরীয়াহ) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি ও রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে প্রণীত।
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
"যা কিছু রাসূল আপনাদের দেন গ্রহণ করুন এবং যা থেকে বিরত রাখেন, তা থেকে বিরত থাকুন।" (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৭)

ইসলামে কোনো আইন মানুষ নির্ধারণ করে না, বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধির অনুবর্তিতা বাধ্যতামূলক।

৩. মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা: সীমাবদ্ধতা ও মুক্তি

গণতন্ত্র ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে মত প্রকাশ, ধর্ম চয়ন, জীবনযাপন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই স্বাধীনতা কখনোই শর্তহীন নয়; কখনোই শরীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে চলতে পারে না বলে গণতন্ত্র দাবি করে না।

ইসলাম অবশ্যই মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, তবে তা আল্লাহর বিধি ও নৈতিকতার শর্তসাপেক্ষে।
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
“আল্লাহ কোনো প্রাণকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেয় না।” (সূরা আল বাকারা ২:২৮৬)

এখানে স্পষ্ট যে, স্বাধীনতার সীমানা আল্লাহ নির্ধারিত, যা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন পদ্ধতি

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়, তা নৈতিক কিংবা ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে। এতে নানামুখী বিরোধ ও স্বার্থ লড়াইয়ের সুযোগ থাকে।

ইসলামে শাসনব্যবস্থা শূরা ও আমীর (খলিফা) ভিত্তিক, যেখানে সিদ্ধান্ত আল্লাহর হুকুম ও শরীয়াহর আলোকে নেয়া হয়। মুসলিম শাসকগণ জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকলেও, সর্বশেষ কর্তৃত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
“আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সূরা আল ইমরান ৩:১৫৯)

৫. সাদৃশ্য: পারস্পরিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণ

উভয় ব্যবস্থাতেই পরামর্শ ও জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। ইসলামি শূরা ও আধুনিক গণতন্ত্রের পার্লামেন্ট উভয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের মতামতকে মূল্যায়ন করে। কিন্তু এই সাদৃশ্য তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

৬. সমসাময়িক বাস্তবতা

গণতন্ত্রের নামে আজ অনেক দেশে ধর্মীয় বিধি উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ এতে ন্যায়, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তা তাত্ত্বিক এবং পৃষ্ঠভূমির। মূল দর্শন, সার্বভৌমত্ব, আইন প্রণয়ন ও শাসন পদ্ধতিতে তারা মৌলিকভাবে ভিন্ন।

মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো:
- আল্লাহর শাসনব্যবস্থা গভীরভাবে বুঝা,
- তার আলোকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করা,
- সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা।

গণতন্ত্রের কিছু দিক যেমন অংশগ্রহণ, পরামর্শ গ্রহণ শিক্ষা নেয়া যায়, কিন্তু সেটাকে আল্লাহর হুকুমের উপরে স্থাপন করা যায় না।

"الْحُكْمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ"
"শাসন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।" (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)

■ মানুষের জ্ঞান,চিন্তাভাবনার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা

মানুষের জ্ঞান ও বোধ এক বিস্ময়কর নেয়ামত, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সব অর্জন, তার সভ্যতা, চিন্তাভাবনা, দর্শন—সবকিছুই সীমারেখায় আবদ্ধ। এ সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা, যিনি সর্বজ্ঞানী, আর মানুষ সেই জ্ঞানের এক ক্ষুদ্র অংশের অধিকারী মাত্র। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্য" (সূরা ইসরা, ১৭:৮৫)। এই আয়াত শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং চিন্তার পরিধি, উপলব্ধির গভীরতা এবং অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতাকেও নির্দেশ করে।

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষ ভবিষ্যতের ঘটনা জানতে অক্ষম। মানুষ জানে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে, এমনকি কোথায় মৃত্যু হবে, তা-ও তার অজানা (সূরা লুকমান, ৩১:৩৪)।
এই অক্ষমতা স্বীকার করা শুধু এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক বিনয় নয়; বরং তা-ই হল প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। আর এই বিনয়ই মানুষকে অহংকারমুক্ত করে। ইসলামে জ্ঞান যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার সাথে বিনয় এবং নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করাও ততটাই জরুরি।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেন, যে বিনয় অবলম্বন করে" (সহীহ মুসলিম)।

মানুষ যখন তার বুদ্ধিকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বলে মনে করে, তখনই সে বিভ্রান্তির পথে এগিয়ে যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দার্শনিকতা, বস্তুবাদ, এবং তথাকথিত মানবিক আইডিওলজিগুলো যেখানেই ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করেছে, সেখানেই ধ্বংস ও বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। হাইডেগার, দারিদা কিংবা ফ্রয়েডের মতো চিন্তাবিদরা স্বীকার করেছেন যে, মানুষের আত্মা, নৈতিকতা, এবং চূড়ান্ত সত্য নিয়ে মানুষ নিজের যুক্তির ওপর নির্ভর করে কিছুই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না।

অথচ কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয়, হিদায়াত ও সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে (সূরা বাকারাহ, ২:২)।

যখন মানুষ তার নিজস্ব যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে সবকিছু নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড মনে করে, তখন তার চিন্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন সে যেটুকু দেখছে, যেটুকু বুঝছে—তাইকে চূড়ান্ত ধরে নেয়। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিজেই এক ধরণের অন্ধত্ব। যেমন,

সূরা হজ্বে আল্লাহ বলেন, "চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় অন্তর, যা মানুষের বুকে আছে" (২২:৪৬)।

এই অন্তরের অন্ধত্ব মানুষকে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবায়—সে ভাবে, সে জানে; অথচ সে জানে না যে, সে জানে না।

ইতিহাসের অনেক বড় বড় ভুল সিদ্ধান্ত এসেছে এই চিন্তার সংকীর্ণতা থেকেই। গণতন্ত্রের নামে, মানবাধিকার রক্ষার নামে, বিজ্ঞান ও যুক্তির নামে মানুষের ওপর বহুবার অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ, সোভিয়েত কমিউনিজম, এমনকি আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রও বারবার প্রমাণ করেছে—মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত দিলে, একসময় সে নিজের ক্ষতিই ডেকে আনে।

ইবনে খালদুন তাঁর Muqaddimah-এ বলেন, "মানুষ যখন নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত মনে করে, তখন সে আল্লাহর বিধানকে অবমূল্যায়ন করে, আর তখনই সমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।"

সত্যিকার মুমিন জানে, সে আসলে তেমন কিছুই জানে না—এবং তাই সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে। তার চিন্তার গভীরতা আসে এই আত্মসমর্পণ থেকে, যেটি ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। সাহাবীদের চিন্তার প্রসারতা ছিল এজন্যই, তারা জানতেন যে, আল্লাহর রাসূল যা বলেন, সেটাই চূড়ান্ত। তাঁরা নিজেদের মতামতের ওপর গর্ব করেননি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার বলেছিলেন, "আমি যদি কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো কথা বলে ফেলি, তবে আমার কথা গ্রহণ করা যাবে না।"

আজকের দুনিয়ায় যেসব চিন্তাবিদ সত্যকে খুঁজেছেন, তাঁদের ভেতর অনেকেই শেষ পর্যন্ত নিরবতা বেছে নিয়েছেন, কারণ তারা স্বীকার করেছেন—মানবচিন্তার সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা অসীম।

ইসলাম মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অস্বীকার করে না, বরং তা শাণিত করে, পরিচালিত করে এবং শুদ্ধ করে তোলে। তাই ইসলাম শুধুই একটি 'ধর্ম' নয়, বরং একটি চিন্তা-চেতনার বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুত্থান। সত্যিকারভাবে মুক্তচিন্তা কখনোই আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করতে পারে না; বরং সেটাই চিন্তার মুক্তি, যেটি আল্লাহর নির্দেশনার আলোয় আলোকিত।

অতএব, মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার সীমাবদ্ধতা বুঝে, সেই সীমার মাঝে থেকেই স্রষ্টার নির্দেশনা মেনে চলা—এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। যে জাতি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী জাতি। আর যে জাতি নিজের সীমিত বুদ্ধিকে সর্বজ্ঞান মনে করে, তার ধ্বংস অনিবার্য।

■ আরব বসন্ত এবং এর প্রভাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান গণতান্ত্রিক পৃথিবী পর্যন্ত মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক বিবর্তনের এই অধ্যায়টি ইতিহাস, আখলাক, ঈমান ও রক্তের গভীর সাক্ষ্য বহন করে। একদিকে আছে রাসূলের মদিনা, অন্যদিকে আছে কায়রো, দামেস্ক, বাগদাদ, তেহরান, ইসলামাবাদ কিংবা আঙ্কারার রাস্তায় ঝরেপড়া মুসলিম রক্তধারা। ইতিহাসের এই রক্তাক্ত এবং বেদনাময় গতিপথ আসলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আসল মুক্তি কোন পথে, আর বিভ্রান্তি কোন পথে।

মদিনার রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কাঠামো। এটি গড়ে উঠেছিল কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক স্বার্থে নয়, বরং একটি রুহানী নেতৃত্বের অনুসরণে, যা কুরআন ও অহীর ছায়ায় পরিচালিত হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাষ্ট্র গড়েছিলেন, তা ছিল ন্যায়, সত্য, ইনসাফ ও তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা জনমত নয়, বরং সর্বজ্ঞ আল্লাহর আদেশই ছিল চূড়ান্ত আইন। যুলুম, বৈষম্য, স্বৈরতন্ত্র এবং মানুষের রচিত মনগড়া আইন—এই সবকিছু থেকে মুক্তি দিয়ে একটি ঈমানভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মদিনার রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সাহাবারা নিজের জীবন ও সম্পদ কুরবান করে এই কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলের পর খোলাফায়ে রাশেদীন যুগেও এই কাঠামো দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, "সবচেয়ে দুর্বল লোকও আমার কাছে তখনই শক্তিশালী, যদি তার হক থাকে; আর সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও দুর্বল, যদি সে অন্যায় করে।" এই নীতিই ছিল ইসলামি শাসনের শেকড়। এরপর উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) পর্যন্ত যে

রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তা ছিল মানব ইতিহাসে এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় আদেশ আল্লাহর বিধান ছাড়া কোন উৎস থেকে আসেনি।

কিন্তু সময় গড়াল, ইতিহাসে রাজতন্ত্র প্রবেশ করল, এরপর মুসলিমরা আব্বাসীয়, উমাইয়া, ফাতেমি, মোগল, উসমানী খিলাফতের মধ্য দিয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পার হলো। যদিও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়, তথাপি খিলাফতের কাঠামো ও রাসূলের রেখে যাওয়া আদর্শগত ভিত্তি অনেকাংশে জীবিত ছিল। ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন মুসলিম বিশ্ব ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি ও ন্যায়ের আলোয় উদ্ভাসিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুনর্জাগরণ, উপনিবেশবাদের উত্থান এবং মুসলিমদের ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের অবক্ষয় ধীরে ধীরে সেই আদর্শ রাষ্ট্র কাঠামোকে ভেঙে দেয়।

একজন মুসলিম চিন্তাবিদের ভাষায়—“যেদিন থেকে মুসলিমরা ইসলামকে তাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু না রেখে তাকে কেবল ব্যক্তিগত আমল বানিয়ে ফেলল, সেদিন থেকেই তারা বিশ্বরাজনীতিতে পরাজিত হয়েছে।” এই বাস্তবতার করুণ প্রমাণ হলো উসমানী খেলাফতের পতন (১৯২৪)। এটিই ছিল মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের শেষ গৌরবময় দুর্গ।

এরপর শুরু হলো জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত মুসলিমদের ভাগ্যপরীক্ষা—তাদের সামনে আসলো এক নতুন ধারণা: গণতন্ত্র। তারা ভাবলো, বোধহয় এটাই মুক্তির পথ। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল, গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে সারা জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। কুরআনে বলা হয়েছে, “আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে” (সূরা আনআম, ৬:১১৬)। গণতন্ত্রের ভিত্তি এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা—যার কোনো আদর্শগত মানদণ্ড নেই, নৈতিক ভিত্তি নেই, কেবল জনমতই তার আইন।

মানবজাতির ইতিহাসে যখনই কোনো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনগণ উঠে দাঁড়িয়েছে, তখনই দুটি বাস্তবতা একসাথে সামনে এসেছে—আশা ও প্রতারণা। আশার নাম হয়েছে ‘বিপ্লব’ আর প্রতারণার নাম হয়েছে ‘ব্যবস্থা’। আজকের বিশ্বে সেই ব্যবস্থাটির নাম গণতন্ত্র। ২০১০ সালের এক শীতল ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিউনিসিয়ার এক সাধারণ যুবক, মুহাম্মদ বুয়াজিজি, নিজের দেহে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে মিসর, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইনসহ সমগ্র আরব বিশ্বে। মানুষ ভেবেছিল এই জ্বলন্ত আগুন হয়তো আনে নতুন বসন্ত। তাই এর নাম হয়ে গেল ‘আরব বসন্ত’—Arab Spring।

কিন্তু বসন্তের ফুল গজানোর আগেই সেই আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মুসলিমদের আশা, বিশ্বাস এবং ঐক্যের সবুজ বাগান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নেতৃত্ব ছিল অহির আলোয় বিকশিত এক রূহানী কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত। যখন নবীজি (সা.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক পরামর্শপূর্ণ শুরা ব্যবস্থায়, যা স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে পরিচালিত হয়।” (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

এই আয়াত নিছক রাজনৈতিক কোনো তত্ত্ব নয়, বরং একটি কার্যকর বাস্তবতা। এই শুরা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব মানে ছিল দায়িত্ব, ক্ষমতা নয়। এমনকি খলিফা ওমর (রাঃ) বলতেন: “তোমরা যদি আমার মধ্যে কোনো অন্যায় দেখো, তবে তরবারির সাহায্যে তা সোজা করে দিও।”

কিন্তু এই শাশ্বত ব্যবস্থার পতনের পর মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে একে একে ভেঙে দেয়, তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় জাতীয়তাবাদ, সামরিক একনায়কতন্ত্র ও তথাকথিত নির্বাচন-নির্ভর গণতন্ত্র। ১৯২৪ সালে খিলাফাহ বিলুপ্তির পর মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় ভয়াবহ বিভাজন, যেখানে আল্লাহর আইন অপসারিত হয়ে পাশ্চাত্যের মতবাদগুলো প্রতিস্থাপিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরব বসন্ত একটি প্রতিক্রিয়া—শত বছরের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক শ্বাসরুদ্ধ আহ্বান। কিন্তু এই আহ্বান যতটা হৃদয়বিদারক, ততটাই বিপজ্জনক ছিল এর ফলাফল। তিউনিসিয়ায় দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসক বিন আলি পালিয়ে যায়। মিসরে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তহরীর স্কয়ারে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনিতে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় স্বৈরাচারী হোসনি মোবারকের। মুহাম্মদ মুরসি নির্বাচনে জয়লাভ করে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসেন।

কিন্তু এখানেই আসে প্রতারণার শুরু। গণতন্ত্রের নামে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্য শক্তি ও আরব বিশ্বের সেক্যুলার চক্রসমূহ একত্রিত হয়ে এই ইসলামী জাগরণকে রক্তে ডুবিয়ে দেয়। ২০১৩ সালের ৩ জুলাই, মুরসিকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। মিসরের রাস্তায় রক্ত ঝরে, মাসরাতি স্কয়ারে একরাতে নিহত হয় ১২০০’রও বেশি মানুষ—ইতিহাসে যার নাম ‘Rabaa Massacre’। অথচ এ ঘটনার নেপথ্যে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দেয় পশ্চিমা গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা বলে পরিচিত রাষ্ট্রগুলো।

তিউনিসিয়ায় ‘বিপ্লব’ সফল হলেও তা ক্রমেই পরিণত হয় এক অন্তঃসারশূন্য সংসদীয় নাটকে। লিবিয়ায় মোয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর সৃষ্ট হয় বিভক্তি ও গৃহযুদ্ধ, যেখানে গণতন্ত্র আসে না, বরং বিদেশি বাহিনী ও মিলিশিয়ারা ভাগ করে নেয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ইয়েমেন আরও করুণ পরিণতির শিকার হয়—একদিকে গণবিক্ষোভ, অন্যদিকে হুথি বিদ্রোহ, আর সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের ভয়াবহ বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আরব বিশ্বের সবচেয়ে ঐতিহাসিক জনপদ।

এই সকল ঘটনার পেছনে ছিল গণতন্ত্রের এক নব্যধারণা—যা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় ইসলামি প্রেক্ষাপটে উপযোগী ছিল না। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“তারা কি জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে? ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে?” (সূরা আল-মায়িদা: ৫০)

গণতন্ত্র যদি এমন কোনো পদ্ধতি হয় যেখানে মানুষ আল্লাহর আইনের জায়গায় মানুষের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করে, তবে তা কেবল শিরকের এক চর্চা। পাশ্চাত্যের নির্বাচনী প্রহসন ও মিডিয়াবান্ধব প্রচারণা মুসলিমদের মধ্যে এই ভাবমূর্তি তৈরি করে যে, নির্বাচন মানেই মুক্তি। অথচ বাস্তবতা হলো, আরব বসন্তের ফলাফল ছিল আরও গভীর দাসত্ব, বিভক্তি এবং পশ্চিমা হস্তক্ষেপ।

বিখ্যাত গবেষক Jean-Pierre Filiu তার বই The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising–এ বলেন, “Arab Spring revealed the profound contradiction between people’s aspiration and the ruling elite’s manipulation.” এই সংঘাত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভণ্ডামিকেই স্পষ্ট করে তুলে।

ইসলামি চিন্তাবিদ ড. আব্দুর রহমান আল-মাহদি লিখেছেন, “গণতন্ত্র হলো এমন এক খেলনা, যা মুসলিমদের হাতে দিয়ে পাশ্চাত্য আমাদের ঈমান ও পরিচয় ধ্বংস করতে চায়। আরব বসন্ত ছিল সেই বিভ্রমের পর্দা—যা ছিন্ন হওয়ার পর দেখা গেল, তা বসন্ত নয়, বরং এক দীর্ঘ শীত।”

এই দীর্ঘ শীতে মুসলিম যুবসমাজ হতাশ হয়ে পড়ে, ইসলামি নেতাদের জেল-জুলুম আর ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, ইসলামি দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়। গণতন্ত্রের নামে কোনো সুসংহত রাজনৈতিক পরিকাঠামো সৃষ্টি হয়নি বরং মুসলিম বিশ্ব হয়ে পড়ে আরও দুর্বল ও বিভক্ত। যে বসন্তের স্বপ্ন দেখেছিল উম্মাহ, তা পরিণত হয় এক রক্তাক্ত দুঃস্বপ্নে।

তবে এই দুঃস্বপ্নই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ইসলামের নেতৃত্বব্যবস্থা গণতন্ত্র নয়, বরং তা হল খিলাফাহ, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত শুরা, যেখানকার মূলনীতি হবে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“হুকুম তো একমাত্র আল্লাহরই।” (সূরা ইউসুফ: ৪০)

এই আয়াতই মুসলিমদের চিন্তার মূলধারা হওয়া উচিত। গণতন্ত্র এক চক্রব্যূহ—যেখানে সত্যকে ঢেকে রাখা হয় "জনগণের ইচ্ছা" নামক পর্দায়, অথচ প্রকৃত ক্ষমতা থাকে দখলদারদের, মিডিয়া-সম্রাটদের, ও কর্পোরেট লবিগুলোর হাতে।

আমরা যদি সত্যিই বসন্ত চাই, তবে তা আসবে তখনই, যখন মুসলিম বিশ্ব আবার নিজের পথ চিনে নেবে। বসন্ত আসবে তখনই, যখন মুসলিমরা শপথ নেবে—আমরা শাসনব্যবস্থা চাই রাসূলের (সা.) আদর্শে, আর প্রতিরোধ চাই মূর্ত প্রতিমা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কারণ প্রকৃত বসন্ত আসে না গণতন্ত্রের চমকানো স্লোগানে, বসন্ত আসে ঈমান, তাকওয়া এবং শারী'আহ-ভিত্তিক এক ঐক্যবদ্ধ সমাজে।

■ রোডম্যাপ ফর ইসলামিক রেনেসাঁ(ইসলামি পুনর্জাগরণের রূপরেখা)

ইসলামী পুনর্জাগরণ বা ইসলামিক রেনেসাঁ হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও নৈতিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি সমগ্র পরিকল্পনা। এটি শুধু ঐতিহাসিক গৌরব ফিরিয়ে আনা নয়, বরং আধুনিক বিশ্বে মুসলিম সমাজকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে শক্তিশালী করে নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে তোলা। আধুনিক সময়ের গ্লোবালাইজেশন, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার স্রোতে মুসলিম সমাজের বিভক্তি, মূল্যহ্রাস এবং আত্মপরিচয় সংকটের মধ্য দিয়ে ইসলামিক পুনর্জাগরণ একান্ত প্রয়োজন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"

(সূরা আল-বাকারা ২:১৪৩)

"এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকো।"

এই মধ্যবর্তী অবস্থান তথা সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য পুনর্জাগরণের রোডম্যাপের বিকাশ অপরিহার্য।

১. আকীদা ও তাওহীদের পুনঃউদ্যম

ইসলামিক পুনর্জাগরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো আকীদার বিশুদ্ধতা, অর্থাৎ তাওহীদের সঠিক ধারণা। মুসলিম উম্মাহ আজকাল নানা ধরনের কুসংস্কার, বিদআত ও দ্বন্দ্বে বিভক্ত। আল্লাহর একত্ববাদ ছাড়া কোনো আদর্শ ও সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। আকীদার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও তা জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম জাতি তার আসল শক্তি ও মর্যাদা ফিরে পাবে।

কুরআনের আলোকে:

“إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَام”ُ

(সূরা আল রূম, ৩০:৩০)

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্মই হলো ইসলাম। অতএব, ইসলামের মূল আকীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া সমাজে বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণ। ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রথম ধাপ হবে আকীদার পুনর্গঠন।

হাদিসে নবী (সাঃ) বলেন:

"إِنَّمَا بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"...ِ

(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম পাঁচ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, যার প্রথম স্তম্ভ হলো শুদ্ধ ঈমান।

আকীদার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রচার ও রাজনৈতিক নেতাদের রোলে বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। জনগণকে ইসলামের একত্ববাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানে সজ্জিত করতে হবে।

২. শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকীকরণ

শিক্ষা হলো সমাজ পুনর্গঠনের মূল চালিকা শক্তি। ইসলামী পুনর্জাগরণে শুধু কুরআন-হাদিসের শিক্ষা নয়, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধকে ইসলামিক তত্ত্বের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা প্রয়োজন। নবী সা. বলেছেন:

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم"ٍ

(ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

আধুনিক শিক্ষার সংকট:

আজকের মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম যুব সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে, যা ধর্মীয় চেতনার অবক্ষয়ের কারণ। এজন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার তিন স্তর:

√ধর্মীয় শিক্ষা: কুরআন-হাদিস, ফিকহ, আকীদা ও দাওয়াহ

√আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা: বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার, স্বাস্থ্য

√মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: আচরণ, সামাজিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার

এভাবে শিক্ষার সমন্বয় মুসলিম সমাজকে শুদ্ধ ও সুশিক্ষিত করবে।

৩. নেতৃত্বের পুনর্গঠন ও খেলাফতি আদর্শ

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হলো সঠিক নেতৃত্ব বা খেলাফত। খেলাফত কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থার সার্বিক কাঠামো যা সমাজের ন্যায়, সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর।

ইতিহাসে নবী সা.-এর পর খলিফারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতারা। তারা শুরা (পরামর্শ) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসন চালিয়েছেন। খেলাফত হারানোর পর মুসলিম বিশ্ব বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। খেলাফতের গুরুত্ব:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ"

(সূরা الحجر ৪৯:১০)ত

খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে।

নবী সা.-এর খেলাফত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

◑শুরা (পরামর্শ) ব্যবস্থা

◑ন্যায়পরায়ণতা ও দরদশীলতা

◑জনগণের অধিকার রক্ষা

◑সমাজের দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি

বর্তমান বিশ্বে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারবে।

৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। জাকাত, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, দান-সদকা, কর ব্যবস্থা এবং গরিব ও অসহায়দের অধিকার রক্ষা ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা।

আজকের মুসলিম সমাজে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সামাজিক অবিচার বিরাজ করছে। ইসলামী পুনর্জাগরণের মাধ্যমে এই অবস্থা পরিবর্তন করে সম্পদ বণ্টনে সমতা আনা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত:

কুরআনের নির্দেশ:

"وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم"

(সূরা আদ্দাহর, ৫৫:৭)

অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য অংশ নির্ধারিত।

হাদিসে নবী সা.-এর নির্দেশ:

"الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ الْمُؤْمِن"...

(মুসলিম)

অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহায্য একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ।
সুতরাং, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠন জরুরি।
৫. দ্বীনের আলোকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
আজকের মুসলিম সমাজ পশ্চিমা রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাবের অধীনে রয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মুসলিম জনগণ সচেতন নয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কাঠামোর প্রভাব ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করে জনগণকে সঠিক দিশা দেখাতে হবে।
মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের বাস্তবতা:
গণতন্ত্রের অনেক দিক ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেমন:
|সার্বভৌমত্বের ধারণা শুধুমাত্র জনগণের অধিকার নয়, বরং আল্লাহর কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করা।
|ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ইসলামী শরীয়াহের অবজ্ঞা
|মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ধারণার সীমাবদ্ধতা
সাংস্কৃতিক সচেতনতা:
মুসলিম সমাজকে নিজের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি গর্বিত ও সচেতন করতে হবে, যেন তারা নিজের চেতনায় শক্তিশালী হয়।
৬. আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সমন্বয়
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। বিভাজন, গোষ্ঠীতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা।
ইসলামী ঐক্যের মূল দিক:কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী>
"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"
(সূরা রূম, ৩:১০)
একতাবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পাবে।
৭. দাওয়াত ও তাবলিগের জোরদার প্রচেষ্টা
সঠিক ইসলামী শিক্ষা পৌঁছানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যাপক দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিকৃত ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিহত করার জন্য ইমাম, আলেম ও দাওয়াতীরা সোচ্চার থাকতে হবে।
ইসলামী পুনর্জাগরণ একটি যুগোপযোগী ও কাঠামোগত পরিকল্পনা, যা শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে না, বরং পৃথিবীর অন্য জাতিগোষ্ঠীর কাছে ইসলামিক আদর্শের সঠিক পরিচয় উপস্থাপন করবে। এই রোডম্যাপ বাস্তবায়িত হলে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ, জ্ঞানময় ও শক্তিশালী হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখনই মুসলিম উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের জীবন ও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু করেছে, তখনই তারা জগতের নেতৃত্ব দিয়েছে—চিন্তা, জ্ঞান, ন্যায়বিচার, এবং মানবিক মর্যাদায়। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় আমরা এমন এক সময় অতিক্রম করছি, যখন মুসলিম সমাজ রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের মতো ধারণাগুলোকে ইসলামের পরিপূরক ভাবা হয়েছে, অথচ বাস্তবতা হলো—এসব আদর্শ ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এ থিসিসে আমি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি কিভাবে গণতন্ত্র মানুষের খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে আইনপ্রণয়ন করে, যেখানে ইসলাম জানায়—
"হুকুম কেবলমাত্র আল্লাহর" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)।
মানবজ্ঞান সীমাবদ্ধ, পক্ষপাতদুষ্ট, এবং বহুক্ষেত্রে স্বার্থপর—এমন এক বাস্তবতায়, মানুষের তৈরি মতবাদ কখনোই আল্লাহর নির্ভুল ও চিরস্থায়ী বিধানের সমকক্ষ হতে পারে না। গণতন্ত্র একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে সত্যকে চাপা দেয়, অন্যদিকে উপনিবেশবাদী পশ্চিমা বিশ্ব তা ব্যবহার করে মুসলিম দেশগুলোতে বিভেদ, দুর্বলতা এবং স্বৈরতন্ত্র চাপিয়ে দেয়।

কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি শুধু ব্যর্থতা চিহ্নিত করা নয় বরং আশার দিগন্ত নিয়েও আলোচনা করার । ইসলামী পুনর্জাগরণের রোডম্যাপ হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের খসড়া। এটি শুধুমাত্র গনতন্ত্র কিংবা পশ্চিমা পরিভাষার থাবা থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক খিলাফাহ নয়—বরং চিন্তাগত মুক্তি, নৈতিক বিপ্লব, আদর্শিক আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের বিকাশের সম্পূর্ণ কাঠামো। একজন ঈমানদারের দৃষ্টিতে এটা স্পষ্ট—ইসলামের বিজয় নির্ভর করে কেবল বাহ্যিক শক্তির উপর নয়, বরং তাওহীদ, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সচেতন ঈমানদারদের উপর।

এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য **প্রথমত** প্রয়োজন—মুসলিম সমাজে চিন্তাগত বিপ্লব। পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মুসলিমদের উচিত কুরআনি ও নববী মানদণ্ডে নিজেদের জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজকে গঠনের মানসিকতা গড়ে তোলা। **দ্বিতীয়ত**, প্রয়োজন জ্ঞাননির্ভর সমাজব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া ও গবেষণা ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠবে। **তৃতীয়ত**, নেতৃত্ব ও

সংস্থাগুলোর মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং একমাত্র আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আজকে আমাদের প্রয়োজন আত্মসমালোচনা, অনুশোচনা ও প্রত্যাবর্তন—“فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ” (অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো)। আত্মসমর্পণ নয়, বরং প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি; দিশাহারা নয়, বরং নবুয়তী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোর পথ খোঁজা—এই হলো রেনেসাঁর পূর্বশর্ত।

একটি নতুন দিগন্তের সূচনা অপেক্ষা করছে, ইন শা আল্লাহ।
যদি আমরা একনিষ্ঠভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাই, যদি আমরা নিজেদের জীবন ও সমাজকে ইসলামের মূলনীতিতে সাজাই, যদি আমরা তরুণ প্রজন্মকে আকীদাভিত্তিক নেতৃত্বে প্রস্তুত করি—তবে ইন শা আল্লাহ, খিলাফাহ আবার ফিরে আসবে, সত্যবাদী মুসলিম নেতৃত্ব আবার বিশ্বকে ইনসাফ ও হিদায়াতের আলো দেখাবে।ইন শা আল্লাহ ।

“ < وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন যারা তাঁর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।”
—সূরা হজ্জ: ৪০